মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা

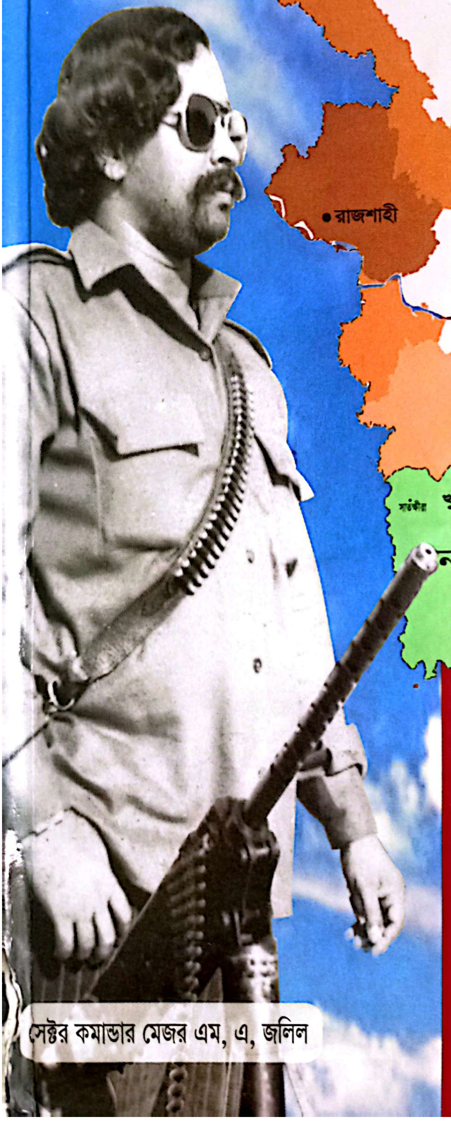

সেক্টর কমান্ডার মেজর এম, এ, জলিল

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা
এডভোকেট-সুপ্রীম কোর্ট
নবম সেক্টরের স্টাফ অফিসার

মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর
ও
আমার যুদ্ধকথা

মোঃ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা
স্টাফ অফিসার, ৯ নম্বর সেক্টর
এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট

ভাস্কর প্রকাশনী
বরিশাল-ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা
মোঃ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা

প্রথম প্রকাশ
৩১ অক্টোবর ২০০৭

সর্বস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
সিরাজ উদদীন আহমদ
ভাস্কর প্রকাশনী, ১৪৮, শান্তিনগর, ঢাকা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় – আব্দুল মান্নান

প্রচ্ছদ
মোমেনটাম
সোনারতরী টাওয়ার (১৩ তলা)
সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণে

কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, পল্টন টাওয়ার, ঢাকা-১০০০।

কম্পিউটার
কে এম মোকতাদার হাসান চন্দন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৯/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

পরিবেশনায়
বুক ভিলা, সদর রোড, বরিশাল
বুক ভিউ, নিউমার্কেট, ঢাকা
গতিধারা, ২৯/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ২০০ টাকা/ বিদেশে ৫ ডলার

ISBN-984-300-000933-05

কৈফিয়ত

আমি লেখক, গল্পকার বা ইতিহাসবিদ নই। গুছিয়ে লেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। আমার এ লেখা কারও জন্য নয়। ৩৫ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন বা ব্যর্থতার বিষয়ে যখনই প্রশ্ন উঠেছে তা নিজের কাছে উত্তরপত্র লেখার চেষ্টা করেছি। জোর করে ভুলতে চেষ্টা করেছি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় দিনগুলো। ফলে আজ এ বয়সে হঠাৎ ২০০৬ সালের ডিসেম্বরের বিজয় মাসে কেন যেন মনে হলো আমার মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্যাবলী ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়টা সঠিক না ভুল ছিল সে বিষয়ে যতদূর মনে আছে লিখে যাই। হয়তো এটা আমার স্বীকারোক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়ে মৃত্যুর পূর্বে অথবা মরণোত্তর বিচার কালে বিচারাধীন আসামির দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি হিসেবে পরিগণিত হবে, নতুন প্রজন্মের বাংলার মাটির জনগণরূপী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, যা আমার এ বিচারপর্বের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল। এ লেখায় কারও নাম ইচ্ছে করে বাদ দেইনি। স্বাধীনতার ৩৫ বছরের পূর্তিতে এসে এ লেখা লিখতে গিয়ে অনেক অনেক ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যক্তিদের নামই বিস্মৃত হওয়ায় মনে আসেনি। তাদের কেউ যদি এ লেখা কোনোদিন পড়ে তার নাম না দেখেন তবে আমাকে এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তা ক্ষমা করে দেবেন। আমি মনে করি একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে তার স্বাধীন করা দেশের মাটিই সব পাওয়া এবং এই স্বাধীন দেশের মাটিতে মৃত্যুর পর যদি স্থান পাই সেটাই হবে শেষ পাওয়া। একটা দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার তার দেশ স্বাধীন হবার পর আর কিছু চাওয়া পাওয়া থাকার কথা নয়। কারণ যে দাতা সে আবার সে দান কেনো ফেরত চাইবে? আমরা যে গাছ লাগিয়ে রেখে গিয়েছি ৩৫ বছর আগে, তা মহীরুহে পরিণত হবে এবং একদিন তা ফসিল হলেও ধ্বংস হবে না। আমি একজন ৫৮ ছুঁই ছুঁই বয়সের আইনজীবী। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধকালের আগে যে যে পেশায় ছিল বেশির ভাগই সে পেশায় ফিরে গেছে। রাষ্ট্রের অসাবধানতার কারণে এসব কৃতী সন্তানদের একটা অংশ মুটে মজুর এবং

পঙ্গু ভিক্ষুকসহ নাম না জানা অখ্যাত পেশায় এসে গেছে। এটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা যারা, এ রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেছেন। আমার এ লেখনিতে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় না করে কোন উক্তি বা বক্তব্য লেখার কালে মনে না নিয়ে লিখেছি। এ লেখায় কোন দিনক্ষণ উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছি কারণ এটা কোন ইতিহাস নয়। এক মুক্তিযোদ্ধার স্বাভাবিক স্মৃতিচারণ। ৯ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অ্যালবামের অনেক নষ্ট হওয়া ছবির মধ্য থেকে যেগুলো ছাপাযোগ্য আছে সেগুলো দেয়া হলো।

আমার প্রথম সন্তান ব্যারিস্টার শফিকুর রহমান রাতুল, দ্বিতীয় সন্তান একমাত্র কন্যা আবিদা রহমান রুমকী এবং কনিষ্ঠ সন্তান রেজাউর রহমান শাহরিয়ার আমাদের নতুন প্রজন্ম ও আমার মতো এক অখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার উত্তরসূরি। ওদের জন্য একটা স্বাধীন দেশ এবং এর সাথে উৎসর্গ করে গেলাম আমার এ লেখাটি। আমার স্ত্রী সেলিনা আক্তার হাসিকে দিলাম এই উৎসর্গিত লেখনিকে এবং লেখনির উদ্দেশ্যকে লালন করতে এই নতুন প্রজন্মের গর্ভধারিণী হিসেবে। তার অনুপ্রেরণা আমার এ লেখাকে সম্ভব করেছে অনেকাংশে।

উৎসর্গকৃত আমার উত্তরসূরিদের কাছে দাবি রেখে যাচ্ছি যে তোমরা এই কাহিনীর কথা তোমাদের মতো নতুন প্রজন্মকে শোনাও এবং তৈরি করো আমাদের উত্তরসূরি নবজাগরণে উদ্দীপ্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের উত্তরসূরি যোগ্য বাহিনী যারা আমাদের অন্তিমকাল শেষে কাঁধে তুলে নেবে আমাদের দেয়া এ সোনার বাংলা পরিচালনার দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধের ধ্যান ধারণায়।

কৃতজ্ঞতা

এই লেখনিটি বই আকারে প্রকাশ করার জন্য যার অবদান প্রথমে স্বীকার করছি তিনি জনাব সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ। তিনি বাংলাদেশ সরকারের অব. অতিরিক্ত সচিব, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং দেশের বরেণ্য ইতিহাসবিদ। বরিশালের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার সফল রচয়িতা। এই বইটিকে মুদ্রণপূর্ব এবং মুদ্রণসহ প্রকাশের সব কাজে তার অবদান কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি।

বরিশালের সাবেক ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও আমার ছাত্র রাজনীতির প্রথমকাল থেকে সর্বসময়ের সঙ্গী বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং 'মোমেনটাম' নামের একটি এড প্রতিষ্ঠানের একজন কর্ণধার এবং 'বরিশালের মুক্তিযুদ্ধের সদরে অন্দরে'র সফল লেখক মনসুরুল আলম মন্টু এবং মোমেনটাম-এর অন্য কর্ণধার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বরিশালের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এবং বর্তমানে একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ শাহনেওয়াজের সার্বিক সহযোগিতা আমার লেখনিকে বই আকারে প্রকাশে সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে। 'মোমেনটাম' প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলমগীর হাই এবং কাজী মোস্তাফিজুর রহমান পাশাকেও একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অ্যাডভোকেট কবিরুল ইসলাম এবং তরুণ আইনজীবী তসরুজ্জামানের কাছেও আমি সমভাবে ঋণী।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নবম সেক্টরের সহঅধিনায়ক ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা এবং একাত্তরের নির্ভীক যোদ্ধা ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগকে।

বন্ধু কম্পিউটার্সের স্বত্বাধিকারি কে এম মোকতাদার হাসান চন্দন আমার লেখনীকে কম্পিউটার কম্পোজের মাধ্যমে ছাপা উপযোগী করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন– তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। মোমেনটাম এ্যাড-এর গ্রাফিকস ডিজাইনার সোহেল আলম এই গ্রন্থের ছবিগুলো নিখুঁত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশকের কথা

'মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা' গ্রন্থের লেখক মোঃ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ বরিশালের দক্ষিণ আলেকান্দায় বিয়ের পর থেকে মোস্তফা আমার সান্নিধ্যে আসেন। আমি তাকে ছাত্রজীবন থেকে জানি। ৬ দফা, ১১ দফা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাঝে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে বেড়ে উঠেছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তার শারীরিক গঠন ও অদম্য সাহস তার নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক শক্তি ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস। ওবায়দুর রহমান মোস্তফা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রত্যুষে বরিশাল শহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিজে মাইকে প্রচার করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পুলিশ ওয়ারলেসে বরিশালে ২৬ মার্চ ভোর রাতে পৌঁছেছিল। সাইক্লোস্টাইল করে সে বার্তা বরিশালের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। ২৭ মার্চ সকালে বরিশালের সদর বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের সাহসী যুব সদস্য ছিলেন গ্রন্থের লেখক ওবায়দুর রহমান মোস্তফা। যে মুহূর্তে চক্রান্তকারী দল, দুর্নীতিবাজ, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বাংলার ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষত করছে, সে মুহূর্তে লেখক আমাদের কাছে স্বাধীনতার দলিল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এ গ্রন্থ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ দলিল।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি একজন সমরনায়কের পরিচয় দিয়েছেন। অন্য দশটি সেক্টর থেকে নবম সেক্টর ছিল ভিন্ন। সে সেক্টরগুলো গড়ে উঠেছে নিয়মিত বাহিনী দিয়ে। অন্যদিকে নবম সেক্টরে কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ও তার সহযোদ্ধারা শক্তিশালী নবম সেক্টর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবম সেক্টরের স্টাফ অফিসার ওবায়দুর রহমান মোস্তফা ঐ সেক্টর গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নবম সেক্টরের সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নূরুল

হুদা, ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, ক্যাপ্টেন মেহেদী, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, এডজুটেন্ট ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, ক্যাপ্টেন খুরশীদ প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের অবদান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, আসমত আলী সিকদার, সওগাতুল আলম সগীর, শাহজাদা আব্দুল মালেক খান, এনায়েত হোসেন খান, নূরুল ইসলাম ভাণ্ডারী, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, মেজর মেহেদী আলী ইমাম প্রমুখ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আমরা তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

অতীব দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক ভুলের কারণে নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর এমএ জলিলসহ অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় খেতাব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্বাধীনতার পর সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। যদি তাদের প্রতি সরকার যত্নবান হতো তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ গঠনে আরও বড় অবদান রাখতে পারতেন। সেদিনের ব্যর্থতার মূল্য জাতিকে এখনও দিতে হচ্ছে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর এডভোকেট ওবায়দুর রহমান মোস্তফা তার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। অনেক কথা, অনেক ঘটনা হয়তো গ্রন্থে আসেনি। বিলম্বে হলেও তিনি নবম সেক্টরের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন– এ জন্য নবম সেক্টরের পক্ষ থেকে, বরিশালবাসীর পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি, তার লেখা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করবে।

লেখক নিজেই বলেছেন, তিনি লেখক বা সাহিত্যিক নন। ১৯৭১ সালের স্মৃতিকথা ও তার মনের অনুভূতি নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তার ভাষায় হয়তো তেমন অলঙ্কার নেই, ভাষার দুর্বলতা থাকতে পারে। তিনি সহজ ভাষায় তার স্মৃতিচারণ করেছেন। যে কোনো পাঠক বিরতিহীনভাবে বইটি শেষ করবেন। আমি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি। ভবিষ্যতে লেখক সংশোধিত আকারে তার গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের আশা রাখে।

সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ

৩০ অক্টোবর ২০০৭
৬২৫ বড় মগবাজার, ঢাকা

বরিশাল থেকে ৯ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা পর্ব

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ দিনগত রাত ৩টা হবে। বরিশালের পেশকার বাড়ি সংলগ্ন সদর গার্লস স্কুলে যাবার জন্য শহরের মুক্তিকামী লোকদের জড়ো হতে আহ্বান জানানো হলো। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেন সব হচ্ছিল। আমরা ছাত্রলীগের যারা নেতৃবৃন্দ ছিলাম আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাবাদী দলগুলোর নেতাকর্মীদের নিকট একটা খবর পৌঁছানো যে, যদি ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হয় তখন হয়তো অন্য পথে যেতে হবে দেশের মুক্তিকামী লোকদের। ইতিপূর্বে ঢাকাসহ তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে গেরিলা যুদ্ধের জন্য সীমিত আকারে প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ করে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণেরপর আমরা যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত নির্দেশনাটি পেয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধের ডাক, স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা আজ যে যাই বলুক, প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণই তখন আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিষয়ে গ্রিন সিগনাল ছিল। আমরা ঘরে ঘরে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলাম যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। এটা যে কেমন হবে কোন কায়দায় হবে কে কীভাবে কোথায় অবস্থান নেবে তাতো কিছুই জানি না। সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে অগ্নিঝরা ঐ সময়ের স্লোগান 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' কত কঠিন স্বপ্নময় ছিল। বাঁশের লাঠি দিয়ে বাঙালি তিতুমীরের মতো যুদ্ধ করবে ইংরেজরূপী পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমএনএ মঞ্জু ভাই (নুরুল ইসলাম মঞ্জু) এবং এমসিএ আমু ভাইসহ (আমির হোসেন আমু) স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে খবর পেলাম ঢাকা থেকে পুলিশ ওয়্যারলেসে বরিশাল পুলিশ লাইনে মেসেজ এসেছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। মেসেজের কপিটি টাইপ করানো হলো যাতে লেখা ছিল 'ঢাকায় পাকসেনারা রাজারবাগ, ইপিআর

(বর্তমানে বিডিআর) হেডকোয়ার্টার পিলখানাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলগুলোর উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।' মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো উপস্থিত মুক্তিকামী জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বরিশালের সংগ্রাম পরিষদের হাইকমান্ড সিদ্ধান্ত নিলেন সকালেই একটি পিকআপ গাড়িযোগে মাইক দিয়ে সমগ্র বরিশাল শহরে ঘোষণা দিতে হবে স্বাধীনতাযুদ্ধের। টাইপকৃত পুলিশ ওয়্যারলেসে প্রাপ্ত মেসেজটির আরো কপি করা হলো। আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলো ২৬ মার্চ সকাল থেকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কয়েকজন কর্মী নিয়ে একটি পিকআপে মাইক লাগিয়ে শহরময় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার। একখানা পিকআপ এবং ড্রাইভার দেয়া হলো আমাকে। বুঝলাম যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক অবস্থা। সরাসরি পিকআপ নিয়ে বরিশাল শহরের দক্ষিণ আলেকান্দার আমাদের বাড়িতে গেলাম। মা, বাবা, বোনেরা ও পাঁচ ভাইয়ের সেঝ ভাই ছাড়া ইতিপূর্বে সবাই শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি বর্তমানে পিরোজপুর জেলার কাউখালীতে চলে গেছেন। সেঝ ভাইকে বলে কাপড়টা বদলে আব্বার দোনলা বন্দুক এবং গুলির ছড়ার বেল্টটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভোর ৫টার মধ্যে সদর রোডে অবস্থিত মজিদ মিয়ার মাইকের দোকানে গিয়ে দুই চোঙ্গার মাইকের হর্ন গাড়িতে বাঁধিয়ে মাইক অপারেটরকে পিকআপের ড্রাইভিং সিটের পাশে মাইকের মেশিন নিয়ে বসিয়ে মাইক্রোফোনটা পিকআপের পেছন জানালা দিয়ে তার গলিয়ে টেস্টিং এর কাজ সেরে বরিশালের সদর রোডের মাইকের দোকানের সামনে পিকআপের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক ব্যাপারটি ঘোষণা দিলাম। তখন কারো মনে হয়নি বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কারো ডাক আসবে। স্বাধীনতাযুদ্ধের এ যেন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতিফলন। তখন সকাল ৬-৩০ মিনিট, ২৬ মার্চ ১৯৭১। আজ এই মুহূর্তে মূল্যায়ন হলো, ঐদিন সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আনুষ্ঠানিক কোন যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা। বরিশালে আমার এই স্বাধীনতার ঘোষণায় কি আমাকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অভিহিত করা হবে? এভাবে অনেক জেলা শহরেও একইভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি

১৯৬৯-৭০ সনের বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। মুসফিকুর রহমান খান বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছাত্রলীগ জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। নির্বাচন পূর্ববর্তীকাল। জেলা নির্বাচনী হাওয়া গমগম করছে। বৃহত্তর বরিশাল অর্থাৎ বর্তমান ঝালকাঠি, পিরোজপুর ভোলা তখন মহকুমা হিসেবে বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালীর প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার আওতাধীন আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমসিএ প্রার্থীদের সাথে বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা রাখতে হতো। আমি, মুসফিক, ছাত্রনেতা খান আলতাফ হোসেন ভুলু, ছাত্রনেতা জহুরুল ইসলাম খান পান্না (জেড আই খান), এনায়েত চৌধুরী, আ স ম ফিরোজ, মনসুরুল মন্টু, আলমসহ বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের প্রচার কাজ চলতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শুরু হলো ষড়যন্ত্র এবং এভাবেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালিরা বুঝতে পারলাম ভোটে জিতলেও পশ্চিমা পাঞ্জাবিরা ক্ষমতার মসনদ ছাড়বে না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শুরু হলো ষড়যন্ত্র। তবে বাংলার জনগণ বুঝে নিয়েছিল আপোসরফা হবে না। এ সময়েই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষের অবস্থান সুসংহত হতে থাকে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ও প্রভাবশালী ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার সপক্ষে অবস্থান নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন করে। একদিন সকালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমান বাসদ নেতা আ ফ ম মাহাবুবুল হক এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ স্বপন কুমার বরিশালে এসে হাজির। বরিশাল ছাত্রলীগের মধ্যে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য এবং বার কাউন্সিলের মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান জেড আই খান পান্নার নেতৃত্বে গোপনে বিপ্লবী

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিরাজুল আলম খানের অনুপ্রেরণায় সমগ্র দেশে স্বাধীনতা পরবর্তীতে গঠিত জাসদের (বর্তমানে বিভিন্ন অংশ বাসদসহ অন্যান্য উপদলের) নেতৃবৃন্দরা এই বিপ্লবী গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময় থেকেই এই বিপ্লবী গ্রুপের ছাত্রলীগের সদস্যগণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা চেতনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ছাত্রলীগের বিপ্লবী গ্রুপের প্রেরিত নেতৃবৃন্দ বরিশালের ছাত্রলীগের বিপ্লবী গ্রুপের সাথে গোপন বৈঠকে বসেন। ছাত্রনেতা জেডআই খান পান্নার সান্নিধ্যে এক সময় দেখি আমিও বিপ্লবী গ্রুপের মধ্যে জড়িত হয়ে গেছি। আ ফ ম মাহাবুবুল হক বরিশালের দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্র থেকে এসেছেন। আমাদের সাথে গোপন সভায় কেন্দ্রের ছাত্রলীগের বিপ্লবী গ্রুপের দেয়া স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের রূপরেখা বর্ণনা করলেন। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বাংলাদেশের পতাকার একটা মডেল পতাকা, স্বাধীনতার ঘোষণার ইশতেহারের কপি হস্তান্তর করলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' হবে বলে আমাদেরকে অবগত করলেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ উপস্থাপন করলেন। এর পরেই আরম্ভ হয়ে গেল গোপনে মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন চলছে। আ ফ ম মাহবুবের দেয়া ভবিষ্যতের কিছু ঘটমান ঘটনার ধারণা পেয়ে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকি। প্রতিদিনই নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্রের এবং বোমা গ্রেনেডের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে থাকি। তখন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনায় একটা বিষয় আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, পশ্চিমাদের সাথে সংঘাত অবশ্যাম্ভাবী। তারা আলোচনার টেবিল খোলা রেখে অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন অজুহাতে গুলি ও বেয়োনেটে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, আলোচনার নামে পাকিস্তানিরা কালক্ষেপণ করে অবশ্যম্ভাবী বাঙালিদের বিদ্রোহ দমনের সকল সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিল এবং অনতিবিলম্বে তারা বাঙারিদের স্বাধীনতার সংগ্রাম রক্তের হোলি খেলায় নিষ্পন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিশ্চিত হলাম সবাই, যে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতা ও পাকসেনাবাহিনী কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদ বাঙালিদের দেবে না। কালক্ষেপণ করে বঙ্গবন্ধুকে অসহিষ্ণু বানাবার এবং তাকে বাংলাদেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তার দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে এ অঞ্চলে গণহত্যা

চালানোর মতলব আঁটছিল। দিন যতই যাচ্ছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তনের কিছু লোক ব্যতীত সকল স্তরের জনশক্তি আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পড়ে স্লোগান দিচ্ছিল 'পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা ঢাকা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' এভাবে এগোতে এগোতে যখন বাঙালিরা একটা জায়গায় পৌছাল তখন বুঝলাম দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলো সংগঠিত হয়ে পড়েছে স্বাধীনতার পক্ষে। ইতিমধ্যে বরিশাল শহরে বেশ কিছু অঞ্চলে আমাদের নেতৃত্বে মিছিলকারীরা পাকিস্তানি পতাকা পোড়াতে থাকল এবং আস্তে আস্তে পাকিস্তানের পতাকার অস্তিত্ব ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া দেশের অন্য কোথাও দুস্প্রাপ্য হয়ে গেল। অবাঙালিরা কেউ কেউ নমনীয় আচরণ করতে লাগল, কেউ কেউ গণহামলার শিকার হলো। কিছু কিছু অবাঙালি ষড়যন্ত্র শুরু করল পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীদের সঙ্গে। অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিতে লাগল। বরিশাল শহরসহ সমগ্র দক্ষিণ বাংলায় তখন একই রূপ নিল। কলেজ, স্কুল, পাঠাগার, ক্লাব এমনকি পাড়ায় পাড়ায় সামরিক ট্রেনিং এবং রাতে গণসঙ্গীতের আসর বাঙালিকে স্বাধীন বাংলা পাবার তরে আকুল করে তুলল। বরিশালের কৃতী সন্তান বর্তমানে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবু আল সায়িদ নান্টুর নেতৃত্বে এই গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হতে লাগল সমগ্র দক্ষিণ বাংলায়।

৭ মার্চের রেসকোর্সের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ হ্যামিলনের বাঁশিবাদকের মতো বাঙালিকে শুনিয়ে গেল মুক্তির গান, স্বাধীনরতার গান। আর যেন বলে দিতে হলো না বাঙালিকে, এই মুক্তির সংগ্রামই স্বাধীনতার সংগ্রাম। কে জানতো; এ সোনার বাংলাকে ভালোবাসার গান, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীত পাওয়ার জন্য সবুজের মাঝে লাল গোলাকার রক্তরাঙ্গা সূর্যের বাংলাদেশের পতাকা পেতে এতো রক্ত দিতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানি ঘাতক সেনাদের হাতে। তবে ব্যাপারটা নতুন নয় কারণ মায়ের ভাষা চাইতে গিয়ে '৫২তে রক্ত দিতে হয়েছে বাঙালিকে আর তো স্বাধীনতা। খাঁচার পাখি মুক্তির জন্য খাঁচার তারে ঠুকতে ঠুকতে যেভাবে রক্তাক্ত হয় সেভাবে মুক্তি পাগল নিরীহ মানুষকে এক সাগর রক্তের সাগরে বাংলা পাড়ে উঠতে রক্তস্নাত হতে হলো। রক্তের ঋণ শোধ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার দামাল ছেলেরা। ঘুম ভেঙে বাড়িতে ডাকাত পড়লে বা আগুন লাগলে কিছু সময়ের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে থেকে যখন ঘোর কেটে গেল তখন দেখা গেল অনকে সন্তান তার বাবা, মা, ভাইবোনসহ বহু আপনজনকে হারিয়েছে। তারুণ্যের রক্ত টগবগিয়ে উঠল শুধু

একটা স্পন্দন তারুণ্যের বুকে, তারা শোনে, ট্রেনিং চাই অস্ত্র চাই কাপুরুষোচিত হামলার, হত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ চাই। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম শুনতে শুনতে ২৩ বছর বয়সে সেদিন অজান্তেই জিঘাংসা চরিতার্থে অর্ধনগ্ন মাকে কাপড় দিয়ে আব্রু ঢাকতে আমিও বেরিয়ে পড়ি, ঝাঁপিয়ে পড়ি মুক্তিযুদ্ধে, মিশে যাই এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনতে।

স্বাধীনতা-পূর্ব বরিশাল ছাত্রলীগের আলোকিত সন্তানগণ

আছমত আলী সিকদার : সাবেক ভিপি, ঢাকা হল (প্রয়াত)।

আমির হোসেন আমু : সাবেক ভিপি, বিএম কলেজ।

তোফায়েল আহমদ : ছাত্রনেতা, বিএম কলেজ এবং পরবর্তীতে ডাকসু'র ভিপি।

আব্দুল বারেক : ছাত্রনেতা, বিএম কলেজ (প্রয়াত)।

এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান : ফকিরবাড়ি রোডের নিবাসী। ১৯৬৫-৬৬ সালে বরিশাল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাবু : ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন।

গোলাম আশেক রূপক : বরিশাল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। বরিশাল কলেজ রো'র গেরাকুল লজে বসবাস করতেন। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক এ্যাসিসট্যান্ট এটর্নি জেনারেল, বর্তমানে আইন ব্যবসা করছেন।

খান আলতাফ হোসেন অরুন : ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন ষাটের দশকে। আটষট্টি-ঊনসত্তরে বরিশাল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ৯নং সেক্টরের পাবলিক রিলেশন অফিসার ছিলেন। সাবেক ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন।

সিরাজুল ইসলাম মানিক : ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন ষাটের দশকে। আমানতগঞ্জ নিবাসী (প্রয়াত)।

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ : ষাটের দশকে ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল জেলা মুজিব বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীন সার্বভৌম

বাংলাদেশের বরিশালের প্রথম নির্বাচিত পৌরসভা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নিযুক্ত হন।

খান আলতাফ হোসেন ভুলু : ষাটের দশকের দ্বিতীয়ভাগে বরিশাল ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে বরিশাল বিএম কলেজের ভিপি ছিলেন। বর্তমানে আইনজীবী।

শেখ আবদুর রব : সত্তর সালে বরিশাল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন।

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা : ১৯৬৯-৭০ সালে বরিশাল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। তিনি ৯নং সেক্টরের এডজুটেন্ট ও পরে সেক্টর স্টাফ অফিসার ছিলেন। তিনি সাবেক ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এবং বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী।

মুশফিকুর রহমান কবির : ১৯৬৯-৭০ সালে বরিশাল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সাবেক সহকারী এটর্নী জেনারেল। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী।

হাবিবুল ইসলাম আনিস তালুকদার : বরিশালের ছাত্রলীগের নেতা। পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং আইনজীবী।

জহিরুল ইসলাম খান পান্না : ষাটের দশকের শেষের ভাগে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং তুখোড় বক্তা ও যুক্তিবাদী ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে পরিচিত। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সদস্য। জহিরুল ইসলাম পান্না বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনবিদ। বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য।

মনসুরুল আলম মন্টু : সাবেক ছাত্রলীগ নেতা। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী।

কামাল আফরোজ খোকা : ছাত্রলীগের দক্ষ সংগঠক। বরিশাল পৌরসভার সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান। আইনজীবী, বর্তমানে সফল ব্যবসায়ী।

আ স ম ফিরোজ : বিএম কলেজের ভিপি, সাবেক সংসদ সদস্য, একজন মুক্তিযোদ্ধা।

শামসুল আলম : ষাটের দশকের শেষের দিকে ছাত্রলীগের বিশেষ নেতা হিসেবে পরিচিত।

মাসুদ মাহমুদ খান : ষাটের দশকের বিশিষ্ট ছাত্রলীগ নেতা।

আবুল হাসান ভূঁইয়া আসু :

বরুন কুমার সেন : বরিশাল ছাত্রলীগের ষাটের দশকের শেষেরদিকের নেতা।

মনিরুল হাসান খান : ষাটের দশকের ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। বর্তমানে বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতা।

আবদুর রশিদ খন্দকার : ষাটের দশকে বরিশাল ছাত্রলীগের কয়েকটি কমিটিতে দপ্তর সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছেন।

সৈয়দ আলমগীর হোসেন : ষাটের দশকের ছাত্রনেতা, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ)।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম : ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ)।

শওকত আলী খান : বরিশাল আলেকান্দার বিখ্যাত খাঁ বাড়ির সন্তান।

তোফাজ্জল হোসেন খোকা : ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনি ছাত্রনেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

সৈয়দ গোলাম মাহবুব : বরিশাল সদর রোডের এই ছাত্রনেতা তুখোড় বক্তা ছিলেন।

শাহাবুদ্দিন আহমেদ তপন : আলেকান্দার আমবাগান নিবাসী তপন বরিশাল ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই তিনি পাক সেনাদের হাতে শহীদ হন।

শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাবু : ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। বরিশাল হাতেম আলী কলেজের ভিপি ছিলেন।

শাহনেওয়াজ : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংগঠক।

শামসুল আলম সামু :

মীর মোশতাক হোসেন সেন্টু : পেসকার বাড়ি নিবাসী। সত্তরের দশকে বরিশাল ছাত্রলীগের বিশেষ নেতা ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাখরগঞ্জ থানা দখলের সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন।

সাধন লাল দে :

অসিত রঞ্জন বিশ্বাস :

হারুন-অর-রশিদ :

আবদুল হান্নান বাদশা :

সন্তোষ কুমার দত্ত :

রুহুল আমিন রুহুল :

এহসানুল কাদের ইসমু :

রেজাই সাত্তার ফারুক : ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা।

গাউসেল আলম লাল :

ফারুক আহমেদ পান্না : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা।

আবদুর রাজ্জাক রাজা : ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন।

রফিকুল ইসলাম বাদশা : ছাত্রলীগের নেতা।

মজিবুল হক : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন।

শাজাহান হাওলাদার : ছাত্রলীগ নেতা।

জামাল হোসেন : নবগ্রাম এলাকার জামাল হোসেন বরিশাল ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন।

মোফাজ্জেল হোসেন মন্টু : ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক : ১৯৬৯ সালে বরিশাল হাতেম আলী কলেজের নির্বাচিত জিএস ছিলেন।

নজরুল ইসলাম নিলু : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা। সাবেক জিএস, বরিশাল পলিটেকনিক্যাল কলেজ।

মজিবুর রহমান : ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা।

ফারুকুল ইসলাম ফারুক : বরিশাল ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা। ভিপি, বরিশাল কলেজ।

জাহাঙ্গীর কবির নানক : বিএম কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি এবং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান।

আজিজুল হক আক্কাস : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা।

আবুল কাসেম : উনসত্তরে স্কুলের ছাত্রনেতা।

নুরুদ্দিন আহমেদ বাচ্চু : ছাত্রলীগের একজন নেতা।

শাজহান : ছাত্রলীগের নেতা।

শামসুল আলম সেলিম : বর্তমানে বরিশালের একজন সফল আইনজীবী।

গাজী সুলতান আহমেদ বাবু : ছাত্রলীগের নিবেদিত কর্মী এবং নেতা।

জিএম ফারুকি : ছাত্রলীগ নেতা।

হেমায়েত উদ্দিন : বরিশাল ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা।

স্বপন কুমার দত্ত : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

আবু বকর সিদ্দিক : বরিশাল ছাত্রলীগেরর অন্যতম নেতা।

সরোয়ার আলম দুলাল : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

সুজিত দে : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

তবিবুর রহমান : ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। সাবেক জিএস, হাতেম আলী কলেজ।

রওশন আরা হেনা : ছাত্রলীগের সাহসী নেত্রী । প্রাক্তন এমপি।

আরতি চক্রবর্তী : ছাত্রলীগের নেত্রী।

পারুল বেগম : ছাত্রলীগের অন্যতম নেত্রী।

ফরিদা : ছাত্রলীগের অন্যতম নেত্রী।

প্রবাল : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

শাজাহান সাজু : ছাত্রলীগের অত্যন্ত সাহসী কর্মী।

মোখলেছুর রহমান : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

মরহুম সাফায়েত হোসেন সাবু : বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মীর শফিউর রহমান (গদু মিয়ার) পুত্র।

মরহুম মন্টু ভাই : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

মরহুম ছবির আহমেদ সিরাজী : ছাত্রলীগের নেতা।

নাছিরুদ্দিন বাবু : ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

এবায়দুল হক চাঁন : বরিশাল ছাত্রলীগের যোগদানর করেন বিএম স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই। বর্তমানে বিএনপি নেতা।

জয়শ্রী সেন জয়া : ছাত্রলীগের অন্যতম নেত্রী।

মোকসেদ আলী বাদল : ভারত থেকে থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার সময় পাকবাহিনীর হাতে ধরা পরেন এবং স্বাধীনতার পরে মুক্তি পান।

সালাউদ্দিন খোকন : নবগ্রাম রোড নিবাসী, ছাত্রলীগের সাহসী নেতা।

এনায়েত হোসেন চৌধুরী : বরিশাল শহর ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তাকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সকলেই জানেন। বরিশাল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অন্যতম নেতা।

হাবিবুর রহমান খান : ভিপি, চাখার ফজলুল হক কলেজ। ১৯৭১ সালে উজিরপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

আমিনুল ইসলাম সুরুজ (সুরুজ তালুকদার) : উনসত্তরের সংগ্রামী ছাত্রলীগ নেতা। তিনি স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমের একজন খেলোয়াড়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের পক্ষে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

আজাদ হামিদ চৌধুরী : বর্তমানে একজন আইনজীবী ও সফল ব্যবসায়ী। বিএম কলেজের জিএস ছিলেন।

নজিব হোসেন চৌধুরী সেন্টু : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা এবং হাতেম আলী কলেজের ভিপি ছিলেন।

এম এইচ বাহাউদ্দিন : ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত নেতা।

জাহিদ হোসেন চৌধুরী : প্যারারা রোড নিবাসী ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা।

কামাল উদ্দিন আহমেদ : ছাত্রলীগের নেতা।

জাহিদ ফারুক শামীম : ছাত্রলীগের নিবেদিতপ্রাণ। পরবর্তীতে সামরিক অফিসার। বর্তমানে ব্যবসায়ী।

সৈয়দ সালাউদ্দিন মির্জা : ছাত্রলীগের নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রথম সারির নেতা।

জিএম ফারুকী : ছাত্রলীগের একজন সাহসী নেতা।

ফরিদুল আলম মাসুদ : ছাত্রলীতের অন্যতম নেতা।

নাছিরুদ্দিন আহমেদ নাছির : ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা।

এই তালিকায় অনেকের নাম উল্লেখ করতে পারিনি এবং জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯৬৯-৭০ সালে বরিশাল শহরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি জিএসদের নাম :

বিএম কলেজ

খান আলতাফ হোসেন ভুলু	ভিপি (১৯৬৯-৭০)
শঙ্কর কর্মকার	জিএস (১৯৬৯-৭০)
আ স ম ফিরোজ	ভিপি (১৯৭০-৭১)
আজাদ হামিদ চৌধুরী	জিএস (১৯৭০-৭১)

শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ

আকতার মোর্শেদ	ভিপি (১৯৬৯-৭০)
লুৎফর রহমান	জিএস (১৯৬৯-৭০)

সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ

নজিব হোসেন চৌধুরী সেন্টু	ভিপি (১৯৬৯-৭০)
ওমর ফারুক	জিএস (১৯৬৯-৭০)

বরিশাল পলিটেকনিক কলেজ

মোফাজ্জেল হোসেন মন্টু	ভিপি (১৯৬৯-৭০)
নজরুল ইসলাম নিলু	জিএস (১৯৬৯-৭০)

১৯৭০-৭১ সালের বরিশালের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ

আওয়ামী লীগ

আবদুল মালেক খান– সভাপতি

এডভোকেট নুরুল ইসলাম মঞ্জুর– সম্পাদক

সদস্য

এডভোকেট আমিনুল হক চৌধুরী
কাজী মহিউদ্দিন আহমেদ
এডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ
এডভোকেট গোলাম আহাদ চৌধুরী
ডাক্তার আজাহার উদ্দিন আহমেদ
মীর শফিউর রহমান (গদুমিয়া)
এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত
আমির হোসেন আমু
এডভোকেট আবদুল বারেক, প্যারারা রোড
মহিউদ্দিন আহমেদ, মেহেন্দীগঞ্জ (পিস্তল মহিউদ্দিন)
এডভোকেট আবদুল করিম সর্দার
এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন
মিসেস হামিদ উদ্দিন
কুট্টি মিয়া
এডভোকেট সোবহান মাসুদ
মতিউর রহমান
এডভোকেট জালাল সর্দার
আবদুল লতিফ, আলেকান্দা
এডভোকেট মনসুরুল আলম
কাজেম আলী মিয়া
এডভোকেট সুধীর চক্রবর্তী
মজিবুর রহসান (কাঞ্চন)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ওয়ালী) :

এডভোকেট মজিবর রহমান তালুকদার
এডভোকেট নিরোদ বিহারী নাগ
অধ্যক্ষ হোসেন আলী
আরব আলী মিয়া
আবদুল গফুর মোল্লা

আবদুস সাত্তর
এমএ ইউসুফ
মোশারেফ হোসেন নান্নু

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী)
নুরুল ইসলাম খান (এনআই খান)
এডভোকেট সিদ্দিক হোসেন
শামসুল হক
আবুল হাশেম
কেরামত সর্দার
আবুল হোসেন ফরহাদ
সালেহ আহম্মদ
স্বরাজ পাল
আবদুল মালেক

গুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির (মস্কোপন্থী)
মনোরমা মাসিমা
দেবেন ঘোষ
নলিনী দাশ
এডভোকেট নুরুল ইসলাম মুন্সী
মুকুল বোস

কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল
এডভোকেট সাইফুর রহমান খান
এডভোকেট এনায়েত পীর খান
সুধীর সেন
ওসমান

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি :
এডভোকেট এস ডবলু লকিতুল্লাহ

আবদুল আজিজ তালুকদার
এডভোকেট আবুল হোসেন
শাজাহান চৌধুরী
জয়নাল মোক্তার ও আরো অনেকে।

কনভেনশন মুসলিম লীগ :

এডভোকেট আবদুর রব
এডভোকেট শাহ নজিবুল হক
এডভোকেট শমসের আলী
এডভোকেট নুরুল ইসলাম শিকদার
রহমতুল্লাহ
সৈয়দ হাতেম আলী
গোলাম মাওলা
আবুল কালাম
স্বরূপ আলী
কালু খান প্রমুখ।

এছাড়া বরিশালের আর একজন রাজনীতিকের নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি এডভোকেট বিডি হাবিবুল্লাহ। তিনি সমাজের এমন কোন অঙ্গন নেই যেখানে পদচারণা না করেছেন। সারা জীবন তিনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের অনুসারী ছিলেন। উনসত্তরের পরে তিনি আসগর খানের নতুন দল তাহ্‌রিখ-ই-ইশতেকলাল পার্টির পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

বরিশালে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ (কার্যকাল ২৬ মার্চ-২৫ এপ্রিল ১৯৭১) :

আবদুল মালেক খান	অর্থ বিভাগ
এডভোকেট নুরুল ইসলাম মঞ্জুর	বেসামরিক বিভাগ প্রধান
মেজর এম এ জলিল	সামরিক বিভাগ প্রধান
এডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ	প্রধান সমন্বয়কারী
মহিউদ্দিন আহমেদ	খাদ্য বিভাগ
এডভোকেট আমিনুল হক চৌধুরী	আইন ও বিচার বিভাগ

এডভোকেট এম শামসুল হক	জ্বালানি বিভাগ
এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন	তথ্য ও প্রচার বিভাগ
এডভোকেট আমির হোসেন আমু	ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
এডভোকেট সর্দার জালাল উদ্দিন	যোগাযোগ বিভাগ
ডাক্তার হুরমত আলী	স্বাস্থ্য বিভাগ
আবদুল বারেক	স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান
এডভোকেট হাসান ইমাম চৌধুরী	সিভিল ডিফেন্স বিভাগ

এই সচিবালয়ের উপদেষ্টা :

আবদুর রব সেরনিয়াবাত এমএনএ
সালাউদ্দিন কায়সার এমএনএ
ডাক্তার আজহার উদ্দিন আহমেদ এমএনএ
কাজেম আলী মিয়া
ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক এমপিএ
এডভোকেট আব্দুল বারেক এমএনএ
আবদুল করিম সর্দার এমপিএ
এডভোকেট সুধীর চক্রবর্তী

সরকারি কর্মকর্তা

কাজী আজিজুল ইসলাম, এডিসি জেনারেল, বরিশাল

গোলাম হোসেন, এডিশনাল এসপি, বরিশাল

তারেক আনিস, আই ডবলু টি এর ম্যানেজার
(১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল বরিশাল পতনের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত সচিবালয় কার্যকর ছিল।)

নিচে বরিশাল স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা দেয়া হলো :

শেখ আবদুর রব	আহ্বায়ক (সভাপতি বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ) ১৯৭০-৭১

মনসুরুল আলম মন্টু	সদস্য সচিব (সাঃ সম্পাদক বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ) ১৯৭০-৭১
ওবায়দুর রহমান মোস্তফা	সদস্য
হাবিবুল ইসলাম তালুকদার	সদস্য
জহিরুল ইসলাম খান পান্না	সদস্য
খান আলতাফ হোসেন ভুলু	সদস্য
মুশফিকুর রহমান কবির	সদস্য
শামসুল আলম	সদস্য
ফারুকুল ইসলাম ফারুক	সদস্য
মনিরুল হাসান খান মনির	সদস্য
মাসুদ মাহমুদ খান	সদস্য

বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামের তালিকা (১৯৬৫ থেকে ১৯৭১)

এবিএম সিদ্দিকুর রহমান	সভাপতি (১৯৬৫-৬৬)
গোলাম আশেক রূপক	সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৫-৬৬)
শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাবু	সভাপতি (১৯৬৬-৬৭)
সিরাজুল ইসলাম মানিক	সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৬-৬৭)
আলতাব হোসেন খান অরুন	সভাপতি (১৯৬৭-৬৮)
খান আলতাফ হোসেন ভুলু	সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৭-৬৮)
সিরাজুল ইসলাম মানিক	সভাপতি (১৯৬৮-৬৯)
খান আলতাফ হোসেন ভুলু	সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৮-৬৯)
ওবায়দুর রহমান মোস্তফা	সভাপতি (১৯৬৯-৭০)
মুশফিকুর রহমান কবির	সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৯-৭০)
শেখ আবদুর রব	সভাপতি (১৯৭০-৭১)
মনসুরুল আলম মন্টু	সাধারণ সম্পাদক (১৯৭০-৭১)

ছাত্র ইউনিয়ন

শহিদুল আলম বাদল	সভাপতি, বরিশাল জেলা ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৬৯-৭০)
নওশের জাহান	সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল জেলা ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৬৯-৭০)

সেনাপতির সন্ধানে

বরিশালের সংগ্রাম কমিটি ইতিমধ্যে চালু করেছে সদর গার্লস স্কুলের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক সচিবালয়। আওয়ামী লীগ নেতা সদ্য নির্বাচিত এমএনএ এডভোকেট নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ক্লার্ক মান্নানের (বর্তমানে ব্যবসায়ী) বাড়ি বরিশালের উজিরপুর থানায়। আমরা তখন যুদ্ধের ট্রেনিং পরিচালনা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি খুঁজছি সম্ভাব্য স্থানে ও ঠিকানায়। মান্নান কন্ট্রোল রুমে এসে হঠাৎ খবর দিল যে পাকিস্তান আর্মির ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের মেজর জলিল নামে এক আর্মি অফিসার এসেছেন তাদের গ্রামের বাড়ি উজিরপুরে ছুটিতে। সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তে তক্ষুণি মান্নানকে কমিটির লিখিত আহ্বানপত্র নিয়ে পাঠানো হলো মেজর জলিলের কাছে তাকে আমাদের সেনাপতি হবার ডাক দিয়ে। ৩৫ বছরের টগবগে ঝাকড়া চুলের পাকবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের মেজর জলিল এক কথায় রাজি হয়ে মান্নানের মোটরসাইকেলের পিছনে করেই দুপুরের আগে বরিশাল শহরের সদর গার্লস স্কুলের কন্ট্রোল রুমে পৌঁছলেন। সেই নির্ভীক সেনাপতির আগমনের খবর পেয়ে বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এবং কলেজের ইউওটিসির সদস্যসহ ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের মতো শত শত রাইফেল ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবক। মেজর জলিল, নূরুল ইসলাম মঞ্জু, আমির হোসেন আমু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান প্রয়াত বারেক ভাই (আব্দুর বারেক), এডভোকেট প্রয়াত জালাল সরদারসহ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনেচ্ছু ব্যক্তিদেরসহ হাজার হাজার মুক্তিকামী লোকদের উদ্দেশ্য তার স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখতে চাইলেন জলিল এবং তাদের আহ্বানে মেজর জলিল যুদ্ধের দামামা বাজানোর মতো ভাষণ দিলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ও প্রস্তুতি

বরিশালের পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারে কয়েকশ' রাইফেল, কয়েকটা ব্রেটাগান ও একটা অকেজো এলএমজিসহ রাইফেলের বাক্সভর্তি বেশ কিছু গুলি পাওয়া গেল এবং বরিশালের পুলিশ লাইনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মতিতে নিয়ে আসা হলো, বিলি বণ্টন হলো, নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করে। একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং ১০০ রাউন্ড গুলি জুটলো আমার ভাগ্যে। রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে গুলিগুলো কোমরে বেল্টের সাথে লাইন দিয়ে ভরে নিলাম, যখন দাঁড়ালাম মনে হলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়িত্ব কাঁধে নিলাম, ভারী মনে হলো অস্ত্র ও গুলিগুলো। শরীরটা উত্তপ্ত মনে হলো এই ভেবে যে, আমার মতো মুক্তিকামীদের উপর অর্পিত হলো বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনী মুক্ত করার দায়িত্ব।

মেজর জলিল দায়িত্ব নিয়েই লেঃ জিয়াউদ্দিন, ভোলার ছিদ্দিক, জব্বার, খুলনার কামরুজ্জামান টুকুসহ বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট এলাকার বেশ কিছু সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে খুলনার গল্লামারী রেডিও স্টেশন ৭ এপ্রিল ১৯৭১ আক্রমণ করলে সেখানে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো কিন্তু ওদের আধুনিক অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে মেজর জলিলের বাহিনী টিকতে না পেরে খুলনার গল্লামারীতে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র দখলে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তার এই প্রথম আক্রমণে মেজর জলিলসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মনোবল বেড়ে গেল। অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়ে আপাতত বরিশালসহ খুলনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, পিরোজপুর, ফরিদপুরের একাংশসহ সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনিং সেন্টার চালু করে সাধারণ ছাত্র, জনগণকে সামরিক ট্রেনিং প্রদান আরম্ভ হলো মেজর জলিলের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও নির্দেশে। ৯নং সেক্টর হিসেবে বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, ফরিদপুর জেলার একাংশসহ বরিশাল অঞ্চলকে ঘোষণার পূর্বেই বরিশালকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড। চাঁদপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর আহ্বানে বরিশাল থেকে নদীপথে এক কার্গো লঞ্চভর্তি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদ

ও খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরিত হলো। সংগ্রাম পরিষদ সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব বেটে দিয়ে সদর গার্লস স্কুলের এক এক ক্লাস রুমে এক একজন সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন বৃহত্তর বরিশাল জেলার '৭০-এর নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ। ডিফেন্সের দায়িত্ব দেয়া হলো মেজর জলিলের উপর এবং সহঅধিনায়ক করা হলো মঞ্জু সাহেবের ভাই ক্যাপ্টেন (অব.) নূরুল হুদাকে (হিরু ভাই)। বরিশালের বেলস পার্কে ট্রেনিং সেন্টার খুলে সংলগ্ন আইডব্লুটিএর দপ্তরের প্রধানের কাঠের দোতলা বাংলো বাড়িটি করা হলো ডিফেন্স হেডকোয়ার্টার। পাকবাহিনীতে চাকরিরত ক্যাপ্টেন মেহেদী ও লেঃ নাছিরও যোগ দিলেন আমাদের সাথে। আমরা যারা ইতিপূর্বে রাইফেল ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ইউওটিসির সদস্য ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য ছিলাম তারা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেলা প্রধান প্রয়াত '৬২-র আইয়ুবিরোধী আন্দোলনের সাবেক ছাত্রনেতা আওয়ামী লীগের আব্দুল বারেক এবং এডভোকেট জালাল সরদার (মরহুম) যিনি সহকারী অধিনায়ক ছিলেন, তাদের নেতৃত্বে শহরের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সদর গার্লস স্কুল সংগ্রাম পরিষদের অস্থায়ী সচিবালয় হিসেবে পরিগণিত হলো। আমাকে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব দিয়ে ঐ সচিবালয়ের একটা কক্ষ দেয়া হলো। ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের (ছাত্রলীগের সদস্য) প্রধান করে এই বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করাহলো সার্বক্ষণিকভাবে কাজ চালানোর।

বরিশাল শহর পাকবাহিনীর দখলে

'৭১-এর ২৬ মার্চ সকাল থেকে '৭১-এর ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত এক মাস স্বাধীন বরিশালের সামগ্রিক কাজ চলতে লাগল। ২৫ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত এই কাজ সুষ্ঠুরূপে চলে কিন্তু ২৫ এপ্রিল সকাল ১০টার পর থেকে পাকবাহিনী বরিশাল শহরে বিমান হামলা চালিয়ে আমাদের সামরিক স্থাপনাসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ চালায়। এদিকে খবর এলো নদীপথে সায়েস্তাবাদের ঝুনাহার নদীমুখের দিকে পাক নৌবাহিনী বেশ কয়েকটা গানবোট নিয়ে গোলা ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মেজর জলিলের নেতৃত্বে মেজর মেহেদী (প্রয়াত), ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ নাছিরসহ আইডব্লুটিসি'র প্যাসেঞ্জার প্যাডেল জাহাজ মাজবী ও ইরানীকে ঝুনাহারের নদীমুখে পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্বে নোঙর করিয়ে নদীর মুখ আটকে দিয়ে নদীর দুই ধারে বাংকার করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। পাকসেনারা প্রথমেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গানবোটের গোলা দেগে মাজবী ও ইরানী জাহাজকে ডুবিয়ে দিল যা কিছুদিন আগেও সেখানে ডুবন্ত ছিল। ভাটার সময় জাহাজ দুটির চোঙ্গা দেখা যেত। ঝুনাহার নদীর মুখে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর গানবোট ও বিমান হামলার মুখে টিকতে না পেরে পিছনে চলে আসে। বেলা ১২টার পরে ৮/১০টা হেলিকপ্টার বরিশাল শহরের উপর চক্কর দিতে থাকে। আমরা আমাদের হাতে থাকা রাইফেল দিয়ে ওগুলোর দিকে নিস্ফল গুলি ছুড়তে থাকি। বিকেলের মধ্যে এ সব হেলিকপ্টার থেকে পাকসেনাদের স্কাউট ও প্যারাট্রুপার নামাতে থাকে সায়েস্তাবাদ এলাকার ঝুনাহার নদীর তীরে, যা ছিল বরিশাল শহরের উত্তর উপকণ্ঠে। নূরুল ইসলাম মঞ্জু, বর্তমান (অব.) কর্নেল কামাল উদ্দিন (ফিরু ভাই), ক্যাপ্টেন হুদা এ অঞ্চলের কিছু মুক্তিকামী যুবক নিয়ে গাড়ি করে এগোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাকবাহিনীর প্যারাট্রুপার গেরিলাদের আক্রমণে তারা পিছু হটলেন। আহত হলেন কামালউদ্দিন ফিরু ভাই, তার উরুতে গুলি লাগল। পূর্বের পরিকল্পনামতো বরিশাল শহরের পশ্চিমে বরিশাল শহর সংলগ্ন লাকুটিয়া জমিদার বাড়িতে অস্থায়ী

দ্বিতীয় অবস্থানে নেতৃবৃন্দ সকলেই যেতে লাগলেন।

ইতিপূর্বেই কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে কর্নেল ওসমানী দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। মুক্তিযুদ্ধের হাইকমান্ড থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুরের একাংশ, পটুয়াখালী-বরগুনাসহ ৯নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করে মেজর জলিলকে ঐ সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে সাথে আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত সংবাদগুলো ঐসময়ে আমাদের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করতো। ২৫ এপ্রিল, '৭১ সন্ধ্যার মধ্যে হানাদার পাক বাহিনী বরিশাল শহরের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে পৌছে গেল। সন্ধ্যার পূর্বেই বরিশাল শহর জনশূন্য হয়ে গেল। আমি অনতিবিলম্বে সঙ্গীয় বাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় পূর্ব নির্ধারিত সদর দপ্তর লাকুটিয়া জমিদারবাড়ীতে যাওয়ার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হই। গেরিলা কমান্ডার পাকিস্তানি নৌবাহিনীর দুর্ধর্ষ কমান্ডো ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ, লেঃ তোফাজ্জল ও ইউটিসি'র ভুলু তাদের অধীনে থাকা ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেশ কিছু গেরিলা বাহিনী নিয়ে বরিশালের আটঘর কুড়িয়ানার বিশাল পেয়ারা বাগানের মধ্যে ক্যাম্প স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পাকবাহিনীকে সেখানে বেশ কটি গেরিলা যুদ্ধে নাজেহাল করেন। সন্ধ্যার পর আমাদের গাড়ির ড্রাইভার আমার সহযোদ্ধা মোঃ গোলাম মর্তুজা মানিককে গাড়ি নিয়ে শহর ছাড়ার কথা বলায় সন্ধ্যার পর পরই যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত হলাম। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, শহর লোকশূন্য, বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন একটা ভুতুড়ে পরিবেশের মধ্যে গাড়িতে ৫/৬ জনের গ্রুপ নিয়ে শহর ছাড়ার উদ্দেশ্যে বরিশালের নতুন বাজারে সহযোদ্ধা মজনুদের বাড়ি থেকে ইতিপূর্বে লুকিয়ে রাখা এক বাক্স থ্রি নট থ্রি গুলি নেয়ার জন্য নতুন বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনের জাগরণী সংঘ ক্লাবের সামনে গাড়িটি হেডলাইট জ্বালানো অবস্থায় দাঁড় করাই। হেডলাইটের আলোতে হঠাৎ নতুন বাজার পুলিশ ফাঁড়ির অর্ধনির্মিত দেয়ালের উপরে বেশ কিছু লাইন দিয়ে বসা হেলমেট মাথায় চাইনিজ রাইফেলসহ খাকি পোশাকের লোক দেখতে পেলাম। মনে হলো এরা বোধহয় আমাদের আনসার বাহিনীর লোকজন। কিন্তু তাদের হাতে চাইনিজ রাইফেল দেখে আঁতকে উঠলাম এই ভেবে যে, আমরা পশ্চিমা সেনাবাহিনীর সামনাসামনি হয়ে গেছি। কিছু বোঝার আগেই উর্দু ভাষায় কে যেন হেঁড়ে গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'কোন হ্যায়'? বুঝতে আর দেরি হলো না

যে, পাকবাহিনী বরিশাল শহরে উঠে গেছে। সবাইকে নামতে বলে এক লাফে নিচে নামলাম জাগরণী সংঘ ক্লাবের পাশ দিয়ে সহযোদ্ধা মজনুর বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম, এর মধ্যে চায়নিজ রাইফেলের তিনটা গুলির শব্দ পেলাম। কয়েক সেকেন্ডের মতো থমকে দাঁড়ালাম এবং কোনো আর্তনাদের শব্দ না পেয়ে বুঝলাম আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। মনে হয় হেডলাইট দুটো নেভাবার জন্য এবং উইন্ডস্ক্রিনে ফায়ার করে আমাদের কাউকে মারার উদ্দেশ্যে এ গুলি করা হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর ঐ গাড়িটা বরিশালের জেলা প্রশাসকের বাড়ির অঙ্গনের পাশে খোলা জায়গায় বেশ কয়েক বছর পড়েছিল। ঐ সময় গাড়িটার কাছে গিয়ে দেখেছি যে, সেদিন দুটো গুলি গাড়ির হেডলাইট দুটো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, আরেকটা গুলি গাড়ির ফ্রন্ট সিটে আমি যেখানে বসা ছিলাম সেই বরাবরে উইন্ডশিল্ড ছিদ্র হয়ে আছে। এখন মনে হলো, গুলিটা আমার জন্য বরাদ্দ ছিল, কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে?

মেজর জলিলের অস্ত্র আনার জন্য এবং বরিশাল পতনের পর আমাদের ভারত গমন

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ক্যাপ্টেন হুদাকে নিয়ে বরিশাল পতনের ৭ দিন আগে ভারতের ২৪ পরগনার হাসনাবাদে আনোয়ারা নামে একটি লঞ্চ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অস্ত্র প্রাপ্তির খবর পেয়ে। সর্বশেষ অবস্থা বিবেচনা করে ভারতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে ট্রেনিং গ্রহণ করে এ সব অস্ত্র নিয়ে দেশের মধ্যে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই।

আমরা ৯নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের অনুপস্থিতিতে বরিশাল সংগ্রাম কমিটির নির্দেশে এই কমিটির নেতৃবৃন্দসহ নদীপথে ২/৩টি লঞ্চ করায়ত্ত করে বরিশালের এমএনএ তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর নেতৃত্বে সুন্দরবনের পশুর নদী দিয়ে এগুচ্ছিলাম। বহুদূরের ধু ধু দেখা যাচ্ছিল মংলা পোর্ট, হঠাৎ করে আমাদের লঞ্চের বহরে দিকে একটা গানবোট ছুটে আসতে লাগল, দূরত্ব বেশি থাকায় আমরা লঞ্চ তিনটি নিয়ে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে ছোট গভীর খাল দিয়ে ঢুকে গিয়ে ঐ যাত্রায় পাকবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেলাম। এভাবেই আমরা বরিশালের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা '৭০-এর নির্বাচনে বরিশাল সদর ও মেহেন্দিগঞ্জ নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ সদস্য (এমএনএ) নূরুল ইসলাম মঞ্জুর নেতৃত্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানা সংলগ্ন মেজর জলিলের ইতিপূর্বে নিয়ে আসা অবস্থানরত লঞ্চ যে ঘাটে ছিল সেই ঘাটের উদ্দেশ্যে সুন্দবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন আকারের নদী খাল পেরিয়ে এগুচ্ছি। আমাদের তখন প্রায় সবাই সিভিলিয়ান। সবেমাত্র ৩০৩ রাইফেল চালাতে শিখেছি। সুন্দরবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদী দিয়ে যাওয়ার সময় সুন্দরবনের নদীর চরে, কয়েকবার কয়েক ঝাঁক হরিণ দেখলাম। মঞ্জু ভাই বীরদর্পে ৩০৩ রাইফেল দিয়ে ২/৩ বার ২/৩ স্থানে হরিণের ঝাঁকের ওপর গুলি ছুড়লেন। গভীর জঙ্গল এলাকায় গুলি শব্দ বেশ বিকট

শোনা গেল। বরাত গুণে মঞ্জু ভাইয়ের ২/৩ বারের ব্যর্থ চেষ্টার পর একটা হরিণ মারা পড়ল। লঞ্চ ভিড়িয়ে সেটাকে তুলে আমাদের সাথে নাজিম নামে একটা ছেলে রাঁধতে জানতো ভালো, সে তার দু'জন সহযোগীকে নিয়ে হরিণটা জবাই করে কেটেকুটে রান্না করে সবার খাওয়ার উপযোগী করলো। এই নাজিমই এখন বরিশাল শহরে নাম করা নাজিম বাবুর্চি। যা হোক ধান ভানতে শিবের গীত ধরেছি। ঐ যুদ্ধের জন্য ভারত থেকে অস্ত্র এনে মুক্তিযুদ্ধ করার আশায় আমাদের বহরে হুদা ভাই (ক্যাপ্টেন হুদা মঞ্জু ভাইয়ের সেঝ ভাই), মরহুম জালাল সরদার, কুতুব ভাই, কালু ভাই, সাবেক আওয়ামী লীগ সাংসদ ছাত্রনেতা আসম ফিরোজ, ফুটবলার সুরুজ, বাদল, তছলিম, কাক্কা, আহত ফিরু ভাইসহ মইনুল (পরবর্তীতে মেজর), তছলিম, মর্তুজা মানিকসহ আমরা অনেকেই ছিলাম। (যাদের নাম ৩৫ বছরের মাথায় এসে মনে এলো না বলে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী)। আমরা পূর্বে খবর পেয়েছিলাম যে মেজর জলিল ভারত থেকে অস্ত্র আনার জন্য আনোয়ারা নামের যে লঞ্চটি নিয়ে বরিশাল পতনের ৭ দিন পূর্বে ভারতে গিয়েছিলেন, তিনি তখন বসিরহাটের হাসনাবাদের ইছামতি (কালিন্দি) নদীঘাটে লঞ্চে সংগ্রহকৃত অস্ত্র তুলছেন। তাই আমাদের আপাতত গন্তব্য সেই হাসনাবাদ। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে একদিন ভারতের সুন্দরবনের কৈখালি রেঞ্জে পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে বিএসএফের সহায়তায় এদিন বেলা ১১/১২টার দিকে হাসনাবাদে পৌঁছলাম সবাই। নদীর ঘাটে দেখি মেজর জলিলকে নিয়ে আসা আনোয়ারা নামের লঞ্চটি দাঁড়িয়ে আছে। দেখে সবার ধড়ে পানি এলো। ঐ লঞ্চের পাশেই আমাদের লঞ্চ ভিড়ল। কম্পিত পদে লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলাম সবাই। লঞ্চ থেকে নেমে প্রথমে মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন হুদা যেখানে ছিলেন সেখানে নেতৃবৃন্দ গেলেন পরামর্শ করতে। আমরা কয়েকজন একটা গোলপাতার ঘরের মিষ্টির দোকানে ঢুকলাম। পেট খিদেতে চোঁ চোঁ করছে তখন। সাথে ১০০ টাকার একটা কায়দে আজম মার্কা নোট, সেটা ভাঙ্গিয়ে প্রায় ১০০ টাকাই পেলাম ভারতীয় টাকায়। ওটা থেকে ৮/১০ টাকা খরচ করে খেলাম কিছু ঐ দোকানে। হঠাৎ হৈ চৈ শব্দ শুনে দৌড়ে নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি তৎকালীন ইপিআরের একটা টহল বোট এসে ঘাটে ভিড়েছে তাতে ভর্তি পাকবাহিনীর তাড়া খাওয়া সামান্য কিছু অস্ত্রসহ বেশ কিছু তৎকালীন ইপিআরের জওয়ানের সাথে একজন সুবেদার ও হাবিলদার। তাদের কাছে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম পাকবাহিনী নদীমাতৃক বর্ডার এলাকার সব ক'টি

বিওপি দখল করে নিয়েছে। যাহোক মনে আর কষ্টবোধ করছিলাম না তখন এই ভেবে যে আমাদের মতো ইপিআরের জওয়ানরাও তাড়া খেয়ে ভারতে চলে এসেছে। হাসনাবাদ বিএসএফের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে হাঁটছি দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকেই দঙ্গল দঙ্গল বাঙালি রিফিউজি কোন রকম কাপড় টাঙ্গিয়ে অবস্থান করছে, এদের মধ্যে হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকের ও নাবালকের সংখ্যাই বেশি। ভাবলাম স্বাধীনতা চেয়ে আমরা আজ রিফিউজি ভারতের মাটিতে।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মেজর জলিলসহ ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভেতর প্রবেশকালে গাবুরায় পাক গানবোটের আক্রমণে পর্যুদস্ত

১৯৭১-এর ৬ মে ইতিপূর্বে বিএসএফের তত্ত্বাবধানে হাসনাবাদের একটা স্বয়ংক্রিয় চালকলের খোলা জায়গায় আমাদের ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সম্পর্কে প্রাথমিক ট্রেনিং দেয়া হলো এবং তারপর একদিন সকালে আমরা জানতে পারলাম মেজর জলিলের নেতৃত্বে ভারতীয় বিভিন্ন অস্ত্র ও গোলাবারুদে ইতিমধ্যে ভর্তি হওয়া আনোয়ারা লঞ্চসহ এমভি সোহাগপুর লঞ্চ নিয়ে ঐ রাতেই আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৈখালী বর্ডার দিয়ে ভারতের রায়মহল হতে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ফুডে-খোলপেটুয়া নদীর মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের ভেতরের নদী খাল বেয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে যাচ্ছি। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অজানা আনন্দও শিহরণে তখন আমরা বিমোহিত। রাত ১২টার পর লঞ্চ দুটো নিয়ে সবাই রওয়ানা হলাম। অস্ত্র গোলাবারুদ ভর্তি লঞ্চে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, ভোলার সিদ্দিক (পরে এমপি হয়েছিল), ওয়াদুদ সর্দার (পরে এমপি হয়েছিল), ভোলার জব্বার এবং আব্দুল হক সবাই ইতিপূর্বে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা হিসেবে পাক আর্মিকে কর্মরত ছিল। পেশকার বাড়ির কালু ভাই ও আমিসহ আরও কিছু মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের সাথে আনোয়ারা লঞ্চে এবং অন্য লঞ্চে অর্থাৎ এমভি সোহাগপুরে ছিলেন নূরুল ইসলাম মঞ্জু, পিস্তল মহিউদ্দিন, লেঃ নাছির, এডভোকেট জালাল সরকার এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের নেতা কুতুব ভাই এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের এমপি বিএম কলেজের সাবেক ভিপি আ স ম ফিরোজ, ফুটবলার আমিনুল ইসলাম সুরুজ, বাদল, নৌ কমান্ডো বাশার, গোলাম মর্তুজা মানিক এবং তসলিমসহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা (সবার নাম মনে পড়ছে না বলে দুঃখিত)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ সুন্দরবন সংলগ্ন বর্ডার কৈখালী পর্যন্ত ভারতীয় বিএসএফের একটি টহল জাহাজ আমাদের বাংলাদেশের সীমান্ত সুন্দরবনের ভেতর নদী পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে গেল। রাত তখন ক'টা খেয়াল নেই। হঠাৎ আকাশে গোলাপি রঙের একটা বিচ্ছুরণ দেখতে পেলাম। পরে জেনেছিলাম পাকবাহিনী শ্যামনগর থানা অন্তর্গত সুন্দবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জের একটা বেড়িবাঁধ বাদ বেষ্টিত অপর তীরে সুন্দরবনের মধ্যের নদীতে কয়েকটি গানবোট নিয়ে আমাদের লঞ্চ দুটিকে অ্যামবুশ করার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল এবং আমাদের লঞ্চ দুটি বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় ঢুকতেই তাদের অগ্রবর্তী গোয়েন্দারা ভেরিলাইটগান দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে পাকবাহিনীকে আমাদের প্রবেশের খবর জানান দিয়েছিল। যা হোক হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে অঝোরে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। দেড়তলা এমভি আনোয়ারা লঞ্চের মাস্টার ব্রিজ সংলগ্ন কেবিনে মেজর জলিল, আমি ও কালু ভাই শুয়ে পড়লাম। কেন জানি প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। তখন জানতাম না এই ঘুম ভাঙার ঘটনা কীভাবে হবে। বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ কেবিনের জানালা দিয়ে চোখে সার্চ লাইটের আলো এসে পড়ল ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে জানালা দিয়ে দেখি আমাদের লঞ্চ দুটোর চারদিকে থেকে ৪/৫টা সার্চলাইট জ্বলছে আর নিভছে। লঞ্চের মাস্টার কেবিনে এসে মেজর জলিলসহ আমাদের বলল যে ৪/৫টা গানবোট আমাদের লঞ্চ দুটোকে ঘিরে সার্চলাইট জ্বালিয়ে নিভিয়ে থামাবার সিগনাল দিচ্ছে। মেজর জলিল মাস্টারকে নদী তীর বরাবর লঞ্চ চালাতে নির্দেশ দিয়ে আমাদের নিয়ে লঞ্চের নিচতলায় চলে এলেন। নিচে নামার সময় দেখি লঞ্চ দ্রুত পাড়ের দিকে চলেছে আর পাকবাহিনী আমাদের লঞ্চের উপর বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে চাইনিজ রাইফেলের গুলি ছুড়ছে। নিচে গিয়ে মেজর জলিল, ছিদ্দিক, ওয়াদুদ, আঃ হক ও জব্বারকে ভারতীয় রাইফেল এসএলআরের ব্যারেলের মাথায় এনারগা রকেট ফিট করতে বলে তিনি একটা রকেট এসএলআরের মাথায় লগিয়ে লঞ্চের পিছনেরদিকে গিয়ে ছিদ্দিককে নিয়ে গানবোটের উপর এনারগা রকেট হামলা চালালেন। হঠাৎ সজোরে লঞ্চটি গাবুরা দ্বীপের বাঁধ ঘেরা পাড়ে আছড়ে পড়ল। চেয়ে দেখি আমাদের আরেকটি লঞ্চ সোহাগপুর একইভাবে পাশাপাশি ভিড়েছে। মেজর জলিল সবাইকে লঞ্চ ছেড়ে অস্ত্রসহ বেড়িবাঁধের ওপরে গিয়ে পজিশন নিতে আদেশ দিলেন। আমার হাতে একটা ৩০৩ রাইফেল। লাফিয়ে সবাই পাড়ে নামছি, একটু এগোতেই একটা পানিভর্তি খাদের মধ্যে, গিয়ে আমরা পড়লাম। তখন জানি না কারা কোথায় আছে। হামাগুড়ি দিয়ে সবাই বাঁধের দিকে এগোতে লাগলাম। পিছনে পাকবাহিনীর ৪/৫টি গানবোটের সার্চলাইট যেন আমাদের খুঁজছে। অঝোরে বৃষ্টি

ঝরছে তার সাথে সাথে সমানে চলছে পাকবাহিনীর অবিশ্রান্ত গোলাগুলি। বেড়িবাঁধ গড়িয়ে গাবুরা দ্বীপের ভেতর পড়লাম। চেয়ে দেখি মেজর জলিলসহ বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক ছিদ্দিক, জব্বার, আঃ হক, ওয়াদুদসহ অবস্থান নিয়ে এলএমজি দিয়ে গানবোটের উপর হামলা চালাচ্ছে। এর পরেই ঐসব গানবোট দিয়ে ছোড়া শুরু হলো অন্ধকারের আকাশ পরিষ্কার করার জন্য ট্রেসার রাউন্ডের গোলাবর্ষণ। সমগ্র এলাকা পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের তরফ থেকে ছোড়া গুলিতে দুটো গানবোটের সার্চলাইট চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নিভে গেল। এতে হানাদাররা আরও ক্ষেপে গিয়ে গানবোটের কামান দিয়ে আমাদের উপর অবিরাম গোলা ছুড়তে লাগল। কোনমতে চেয়ে দেখি আমাদের লঞ্চ দুটো গোলার আঘাতে আগুন ধরে গেছে। বুঝলাম আমাদের ওখানে অবস্থান মানে পাকবাহিনীর হাতে ধরা দেয়া। মনের মধ্যে চাপা ব্যথা নিয়ে সবাই পিছু হটে বেড়িবাঁধ ঘেরা দ্বীপটার মাঝ বরাবর ছুটতে লাগলাম এবং গানবোটের সার্চলাইট ও ট্রেসার রাউন্ডের আলো পড়তেই শুয়ে পড়ে আলো সরে যেতেই ফের দৌড়াতে লাগলাম। অন্ধকারে জানি না কোথায় যাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো সবার কথা। এদিকে বৃষ্টি থেমে এসেছে। গান বোটগুলোরও অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না অন্ধকারে একে অপরকে ডাকছি কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেলাম আমাদের দলটা তিনটা ভাগ হয়ে গেছে। একভাগে আমরা ১৮/১৯ জনের মতো তাতে আমিসহ নুরুল ইসলাম মঞ্জু, কুতুব, নেভার বসার মর্তুজা মানিক, তছমিসহ আরো অনেকে। পিস্তল মহিউদ্দিন, লেঃ নাছির, কালু ভাই, জালাল সরদার, বাদল, আ স ম ফিরোজ, সুরুজসহ একটা দল অন্ধকারে কোনদিকে যেন গেল। সবাইকে নাম ধরে আমরা ডাকছি কিন্তু জবাব নেই। মেজর জলিলসহ আরো কয়েকজন যারা বেড়িবাঁধের উপর পজিশন নিয়ে গানবোটের সাথে যুদ্ধ করছিলেন তাদেরকেও আমরা আর পেলাম না। কিছুক্ষণ আমাদের দলটা বসে থেকে গাবুরা বেড়িবাঁধ ঘেরা দ্বীপটির একদিকে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের যার কাছে যে অস্ত্র ছিল তা হাতছাড়া করিনি তখনো। হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টি থেমে সকাল হয়ে এলো। দূরে বিলের ভেতরে একটা গাছপালা ঘেরা বাড়ি দেখতে পেলাম। সেদিকে চলতে লাগলাম। অন্যদের খবর নেই তারা কোন দিকে গেছে। পরে জেনেছি পিস্তল মহিউদ্দিন, জালাল সরদার, কালু ভাই, বাদল, ক্যাপ্টেন নাছির ধরা পড়েছে পাকবাহিনীর হাতে। অকথ্য নির্যাতন চলেছে তাদের উপর পাকবাহিনীর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বিধ্বস্ত অবস্থায় মুক্তি পান। সুরুজ ও আ স ম ফিরোজ

কপাল গুণে পাকবাহিনীর হাত থেকে ধরা পড়ার সময়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মেজর জলিল পরে শুনেছি ২/৩ জন সঙ্গীসহ ওখানকার শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যানের বাড়িতে হঠাৎ উঠে পড়েন এবং পরবর্তীতে বহু কায়দা করে ওখান থেকে পালিয়ে ভারতে পৌছেন।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুর নেতৃত্বে আমাদের দলটা গাবুরা দ্বীপের একটা বাড়িতে ঢুকলাম। ঢোকার সময় আমাদের সাথে থাকা অস্ত্রগুলো ধানের খড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। বাড়িটার লোকজন সকলেই রাতের গোলাগুলিতে বাড়িছাড়া, যারা আছে তাদের দয়ায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থেকে সন্ধ্যার পর তাদের নিকট থেকে জেনে ভারতের সীমান্তের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমি, নেভাল বসার, মানিক, তছলিম, কুতুবসহ ১৭/১৮ জন মঞ্জু ভাইয়ের নেতৃত্বে হাঁটছি। কত মাইল হেঁটেছি রাতে টের পেলাম না, সকাল হতেই সীমান্তের ৫/৬ কিলোমিটার দূরে একটা বাড়িতে উঠলাম। তারা দয়া করে টাকার বিনিময়ে চালের খুদ আর খেসারি ডাল দিয়ে খিচুড়ির মতো রেঁধে দিল, সাথে উপরি হিসেবে সুন্দরবনের মধুও দিল। মনে হয় অমৃত খাচ্ছি দু'দিন না খাওয়া লোকগুলো। শান্তি কমিটির কয়েকজন দালাল এসে আমাদের সীমান্তে পৌছে দেয়ার নাম করে আমাদের যা ছিল হাতিয়ে নিল। পরদিন সন্ধ্যার পর আমাদের হাঁটিয়ে একটা ছোট নদীর ধারে রেখে ওরা চলে গেল। সবার পা ফুলে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। নুরুল ইসলাম মঞ্জুসহ আমরা সবাই অবশেষে রাতে সীমান্তের কালিন্দী নদী (ইছামতি) নৌকা দিয়ে পার হলাম। ওপারে বিএসএফের একটা বিওপিতে উঠলাম। সেখান থেকে সকালে ভারতীয় যাত্রীবাহী লঞ্চে করে হাসনাবাদ পৌছলাম।

আমরা সবাই হাসনাবাদে আমাদের রেখে আসা (ইতিপূর্বে অকেজো হয়ে যাওয়া) ওয়াপদার লঞ্চটায় স্থান নিলাম। ক্যাপ্টেন হুদা এবং বরিশালে বসে পাকবাহিনীর গুলি উরুতে লেগে আহত ফিরু ভাইরা ঐ লঞ্চেই ছিলেন। বাংলাদেশে যাবার আগে নুরুল ইসলাম মঞ্জু, লেঃ নাছির, ক্যাপ্টেন হুদার পরিবারকে হাসনাবাদে একটা বাড়িতে রেখে যাওয়া হয়েছিল। ৩/৪ দিন পরে মেজর জলিলও হাসনাবাদে পৌছলেন। ২/৩ দিন পর মেজর জলিল ও এমএনএ, নুরুল ইসলাম মঞ্জুকে ভারতীয় বাহিনী কলিকাতার আর্মি হেডকোয়ার্টার ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে গেল। ভারতীয়দের সন্দেহ হয়েছিল যে, মেজর জলিল হয়তো অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদসহ লঞ্চ দুটি পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেবার জন্য এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা নিশ্চিত হয় যে ব্যাপারটা একটা

দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা সন্দেহমুক্ত হবার পর হাসনাবাদ ফিরে এলেন, পুনরায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে যুদ্ধ করার জন্য।

নতুন আশার বুখ বেঁধে বশিরহাটের হাসানাবাদ থানার টাকিতে ৯নং সেক্টরে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলো। খুব কাছেই টাকী বাজার, তার সাথেই ভারত, বাংলাদেশ বিভক্তকারী কালিন্দী নদী (ইছামতি হিসাবেও পরিচিত) এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের বাংলাদেশের দেবহাটা খোনা দেখা যায়। ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার হিসেবে সর্বপ্রথম টাকীতে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়। বশিরহাট থেকে হাসানবাদ পর্যন্ত এলাকার প্রায় ১০০টির উপর রিফিউজি ক্যাম্প। তকিপুর হাইস্কুল সদর রাস্তা থেকে একটু ভিতরে পশ্চিমে, সেখানে মেজর জলিল স্থাপন করলেন ট্রেনিং বেইজ ক্যাম্প। আমরা প্রথমে সেখানে স্থান পেলাম। আমি, নেভাল বাসার, মর্তুজা মানিক, তসলিম ও অন্যরা একটা তাঁবুতে অন্যদের সাথে থাকতে লাগলাম। প্রত্যেককে একটা শতরঞ্চি, চাদর এবং একটা হাওয়া বালিশ দেয়া হলো। তখন বর্ষাকাল। কাদাপানিতে একাকার। তকিপুর স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল ঘরের প্রায় সবটাই মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিল। ৮নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর ওসমানের দাক্ষিণ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ৯ নং সেক্টরে বেশ কিছু ৩০৩ রাইফেল, ২টা এলএমজি ও ২টা ২ ইঞ্চি মর্টারসহ বেশ কিছু গোলাবারুদ পাওয়া গেল। এই তকিপুর হাইস্কুলই সর্বপ্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের ৯নং সেক্টরের বেইজ ক্যাম্প হিসেবে স্থাপিত হলো।

একদিন মেজর জলিল সকালের দিকে এলেন ক্যাম্পের সার্বিক পরিচালনা ও দেখাশোনার জন্য। সাতক্ষীরার এমএনএ গফুর সাহেব (মরহুম) এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জু দায়িত্বে ছিলেন তকিপুর ক্যাম্পের পরিচালনার। তৎকালীন মুজিবনগর (কলকাতার ৮নং থিয়েটচার রোডের একটি পুরনো দোতলা বাড়ি) তখন মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালায়। হঠাৎ করে একদিন মেজর জলিল আমাকে টাকিতে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে দেখা করতে বললেন। এ আদেশ আমাকে বিচলিত করলো। গেলাম সেখানে ঐ দিনই। তিনি আমার ব্যাগেজ নিয়ে হেডকোয়ার্টারে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। রাতেই চলে গেলাম হেডকোয়ার্টারে। রাতে তার অফিস ঘরে আমাকে ডেকে আমাকে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে কাজ করার আদেশ দিলেন। খবরটা শুনে আমার অন্য সাথীরা ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। ৫/৬ দিনের মধ্যে তিনি আমাকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের এডজুটেন্ট হিসেবে অনারারি ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় নিয়োগ

দিলেন। তখন বয়স আমার ২৩ বছর হবে। সকাল থেকে রাত ৩/৪টা পর্যন্ত মেজর জলিলের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে থেকে কাজ করতে লাগলাম। তার পরিকল্পনা মতো ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারকে একটা মুক্তিযুদ্ধের সময় উপযোগী হেডকোয়াটার হিসেবে আমরা রূপান্তরিত করলাম। উপরের মহলের সম্মতি নিয়ে ৩/৪টা ইয়ুথ ক্যাম্প স্থাপন করা হলো টাকি হাসনাবাদ এলাকায়। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আসা যুবক এবং বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্প থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের খুঁজে ঐসব ইয়ুথ ক্যাম্পে আমরা আনতে লাগলাম। এ ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী এবং মুজিবনগর সরকারের সব ধরনের সহযোগিতাও পেলাম। প্রতিটি ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্ব ৯নং সেক্টর এলাকার তৎকালীন এমএনএ, এমসিএদের দেয়া হলো। ছাত্রনেতাদের খুঁজে প্রতিটি ইয়ুথ ক্যাম্পের পলিটিক্যাল মডিটভেটর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হলো। ইতিমধ্যে বিহারের চাকুলিয়া নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের ৬ সপ্তাহের ট্রেনিয়ের জন্য ব্যবস্থা করলো ভারত সরকার। ইতিমধ্যে স্থাপিত ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পের চাহিদামতো যুবকদের পাঠানো আরম্ভ হলো। সিদ্ধান্ত জানলাম যে, যে সেক্টর থেকে ছেলেরা ট্রেনিংয়ে যাবে তাদের ট্রেনিং শেষে ঐ সব সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হবে। এমএনএ নূরুল ইসলাম মঞ্জুকে নবম সেক্টরের প্রথম বেইজ ক্যাম্প তকিপুরের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

ইনডাকশন পদ্ধতিতে গেরিলা যুদ্ধ

একপর্যায়ে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারের আমরা অফিসারদের নিয়ে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেরা টেনিং শেষে ফিরে এলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গ্রুপে গ্রুপে বাংলাদেশের মধ্যে ৯নং সেক্টরভুক্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ চালানোর জন্য পাঠানো হবে, যাতে দেশের ভেতরে অবস্থান করে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওদের পর্যুদস্ত করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা যায়। এদের অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতে মিত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের ক্যান্টনমেন্টে 'চার্লি সেক্টর' নামে ৯নং সেক্টরের সব বিষয়ে সহায়তাকারী সেক্টর হিসেবে স্থাপিত হলো। ঐ চার্লি সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর খ্রিস্টান এক অফিসার ব্রিগেডিয়ার সালেহ। তার কাজে সহায়তার জন্য কর্নেল মুখার্জী ও মেজর সরকারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে একটা লম্বা দোতলা দালানে চার্লি সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলো। ৯নং সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ সেক্টর হেডকোয়ার্টারের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে রেশনসহ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশে প্রবেশের সময় হাত খরচ হিসেবে প্রয়োজনীয় পাকিস্তানি মুদ্রা সরবরাহ করা হতো এ চার্লি সেক্টর থেকে।

বিহার থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের 'এফএফ' নামে অভিহিত করা হয়। ৯নং সেক্টরের অন্তরর্ভুক্ত এলাকার এফএফরা নিজ নিজ এলাকায় ইনডাকটেড হয়ে সমন্বিতভাবে গেরিলা যুদ্ধ করবে– এই সিদ্ধান্তে প্রতিদিন রাতে দলে দলে এফএফদের এই পদ্ধতিতে সমগ্র ৯নং সেক্টর এলাকায় প্রেরণ চলতে লাগলো। ৯নং সেক্টরের মূল যোদ্ধা হিসেবে এসব এফএফরা অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ৯নং সেক্টরের প্রায় এলাকাই শত্রুমুক্ত করে।

প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধাদের বাংলাদেশে ইনডাকসনের জন্য বেইজ ক্যাম্প– বাকুন্ডিয়া

টাকি থেকে বশিরহাট যেতে ৩/4 কিলোমিটার দূরত্বে ইছামতি সীমান্ত নদীর কাছাকাছি একটা পুরনো ভাঙাচোরা জঙ্গলে ভরা জমিদার বাড়ি পাওয়া গেল। জায়গাটার নাম বাকুন্ডিয়া। মাটির রাস্তা দিয়ে জীপে করে হেডকোয়ার্টার থেকে যেতে ২০/২৫ মিনিট লাগতো। ঐ জমিদার বাড়ির জীবিত মালিকপক্ষ এ বাড়িটাকে আমাদের ব্যবহারের জন্য দিলেন।

পাকিস্তান নৌবাহিনীর লিডিং সিম্যান আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সুলতান উদ্দিনকে পাওয়া গেল মুজিবনগর (৮নং থিয়েটার রোড) থেকে। ছিপছিপে লম্বা সুন্দর দাড়িওয়ালা চেহারার লোকটিকে প্রথম দর্শনেই মনে হলো সে মুক্তিযুদ্ধে একটা অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চায়। পাক নৌবাহিনীর একজন দুর্ধর্ষ ফ্রগম্যান কমান্ডো হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীতে। পাক সরকার পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে অন্যতম একজন আসামি করে ৬৯ সালের মুক্তি লাভ পর্যন্ত পাকবাহিনীর কাছে অনেক নির্যাতিত হয়েছেন। গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্তরা 'এফএফ' নামে পরিচিত ছিল। যারা সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশের সদস্য ছিলেন। তারা পরিচিতি ছিল এমএফ হিসেবে। তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য গেরিল বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত করতে একটা ইনডাকশন ক্যাম্পের চাহিদা পূরণ হলো বাকুন্ডিয়ার ভাঙ্গা জমিদার বাড়িকে সেক্টরের বেইজ ক্যাম্প হিসেবে স্থাপন করে। ঐ ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে সুলতান উদ্দিনকে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় দায়িত্ব দেয়া হরো। ইতিমধ্যে প্রায় ৩শ'র মতো ৬ সপ্তাহের স্বল্প গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা টাকি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিনকে (পরবর্তী জাসদের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন বর্তমান প্রয়াত) এবং তাকে সহায়তার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর আজমকে পরদিন ভোরেই বাকুন্ডিয়ার ভাঙ্গা জঙ্গলাকীর্ণ জমিদার বাড়িতে পাঠিয়ে

ওটাকে বেইজ ক্যাম্প উপযোগী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। বিহারের চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রথম এ দলটিই ৯নং সেক্টরের সর্বপ্রথম এফএফ হিসেবে পরিগণিত হলো ৯নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। সারা দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি করে ক্যাপ্টেন সুলতানের নেতৃত্বে ঐ ৩০০ এফএফ বাকুন্ডিয়ার ভাঙ্গা জঙ্গলাকীর্ণ জমিদার বাড়িটাকে একটা সুশৃঙ্খলা গেরিলা বাহিনীর বাসোপযোগী বেইজ ক্যাম্পে রূপান্তরিত করল। পরদিন ভোরে সেখানে আমরা মেজর জলিলের সাথে গিয়ে দেখলাম জঙ্গলে ঘেরা একটা সুশৃঙ্খল গেরিলা বেইজ ক্যাম্প। ক্যাম্প সংলগ্ন একটা দীঘি। সেটার চারদিকে তাঁবু খাটিয়ে এফএফ ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ির ব্যবহার্য একটা অংশে ক্যাম্প অফিস, অস্ত্র গোলাবারুদ রাখার জন্য অস্ত্রাগার (আর্মারী) এবং রেশনসহ অন্য রসদ রাখার জন্য গুদাম স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন সুলতান, সুবেদার মেজর আজমের সহায়তায় বিহারের চাকুলিয়া থেকে স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত এফএফ গেরিলারা এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এ খবর মুজিবনগর হেডকোয়ার্টারে জানানো হলো।

৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার

পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমায় টাকিতে বাংলাদেশ ভারত বিভক্তকারী সীমান্ত নদী কালিন্দীর (ইছামতি) ভারত অংশ অবস্থিত নদীর তীর থেকে ১০০ গজ দূরে একটি একতলা পুরাতন বাড়ি ৯নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ভাড়া নেয়া হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন প্রথম সেনা অফিসার ট্রেনিং কোর্সে ৯নং সেক্টর থেকে যেসব বেসামরিক যুবকদের পাঠানো হয় তারা হলো– মেজর মঈনুল, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলী, লেঃ আহসান উল্লাহ, কর্নেল কামাল উদ্দিন ফিরু এবং ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামালসহ বাংলাদেশের প্রথম কমিশন্ড অফিসার ব্যাচের ট্রেনিংয়ে উত্তীর্ণ হয়ে মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর দাফতরিক নির্দেশে উল্লিখিত অফিসারদের মধ্যে কামালউদ্দিন ফিরু বাদে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অন্য ৪ জনকে পাঠানো হলো। ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পরিণত করার কাজ পূর্ণ উদ্যোমে কাজ শুরু করলাম সবাই মিলে।

উল্লেখ্য, ৯নং সেক্টরে কোন নিয়মিত বাহিনী ছিল না, বেশিরভাগই অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার, বাংলাদেশের প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত চারজন অফিসার এবং বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য ও গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত এফএফ যুবকদের নিয়ে বিশাল গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী দ্বারা ৯নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

হেডকোয়ার্টারে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের বসার ঘরেই অপারেশন রুম স্থাপন করা হয় ৯নং সেক্টর এলাকার একটা বড় ম্যাপ বোর্ডে লাগিয়ে। অন্য রুমে আমি স্টাফ অফিসার, সেক্টর এ্যাডজুটেন্ট ফ্লাঃ সাঃ ফজলুল হকের বসার জায়গা। অন্য একটা রুমে হাবিলদার মজিদ, অফিস সহকারী এবং নায়েক সুবেদার মাজেদুল হক ইন্টেলিজেন্স অফিসার বসতো। বাকি দুটো কামরার ছোটটিতে মেজর জলিলের সাথে আমি ছোট দুটো চৌকিতে ঘুমাতাম। অন্যটাতে

বাইরে থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ থাকতেন। হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে একটাতে সেক্টর পাবলিক রিলেশন অফিসার আলতাফ হোসেন অরুন এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক এবং অন্যটাতে সিগনাল কোরের কয়েকজন তৎকালীন ইপিআরের সদস্য একটা বাঁশে এ্যান্টেনা লাগিয়ে সিগনাল কোরের অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টারের কার্যক্রম চলে। ভারতে আগত যুবকদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রিক্রুটমেন্টের জন্য বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল আলম ফরিদকে অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৯নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন পর্ব

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, ফরিদপুরের পাকিস্তান নৌবাহিনীর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ক্যাপ্টেন খুরশিদকে মুজিবনগর হেডকোয়ার্টার থেকে নিয়ে এলেন একদিন। তার সাথে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো যে, মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিকে ৯নং সেক্টরের আওতায় এনে এই সব দেশপ্রেমিকদের মুক্তিযুদ্ধের কর্মে লাগানো হবে। এবং এভাবেই ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, ক্যাপ্টেন খুরশিদ, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুবেদার মেজর তাজুল ইসলাম, কর্পোরাল সামাদ, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন বাবুলসহ বেশ কিছু আগরতলা মামলার সাথে সম্পৃক্ত সামরিক ব্যক্তিকে ৯ নং সেক্টরে সমাবেশ ঘটানো হলো। বরিশালের বাবুগঞ্জের তৎকালীন এমসিএ, আগরতলা মামলার আরেক অন্যতম আসামী তৎকালীন মামলা চলাকালীন সময়ে পাকবাহিনীর গুলিতে আহত ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বর্তমানে প্রয়াত) ৯নং সেক্টরে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে দুর্ধর্ষ পাকিস্তান নৌবাহিনীর ফ্রগম্যান গেরিলা, ক্যাপ্টেন বেগ যিনি বরিশাল পতনের পর বরিশালের স্বরূপকাঠির আটঘর, কুরিয়ানা অঞ্চলের ঘন পেয়ারা বাগানে পাকবাহিনীর সাথে তার গড়া গেরিলা বাহিনীসহ অসম সাহসিকতায় যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও যোগ দিলেন। পিরোজপুরের দুর্দান্ত গেরিলা যোদ্ধা লেঃ জিয়াউদ্দিন ইতিপূর্বে তার গঠিত বাহিনী নিয়ে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে আস্তানা গেড়েছেন। তিনিও তার কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে ৯ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে মেজর জলিলের সাথে সাক্ষাত করে তার অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সাতক্ষীরার দেবহাটার সাজাহান মাস্টার (প্রয়াত) ইতিপূর্বে তার গড়ে তোলা মুজাহিদ বাহিনীর কয়েকশ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ৯নং সেক্টরের আওতায় যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হলেন। ফরিদপুরের অসম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে ৯নং সেক্টরের আওতায় যুদ্ধ করার জন্য একাত্মতা ঘোষণা করলেন। ক্যাপ্টেন মেহেদী (বর্তমানে প্রয়াত) যিনি বরিশাল শহর

পাকবাহিনীর দখলে আসার পূর্ব পর্যন্ত মেজর জলিলের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন, তিনিও এসে গেলেন ৯নং সেক্টরের কমান্ডের আওতায় পটুয়াখালী এলাকায় যুদ্ধ চালাতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিগন্যাল কোরের ক্যাঃ শাজাহান যিনি পরবর্তীতে সমগ্র বরিশালসহ বাংলাদেশে শাজাহান ওমর নামে পরিচিত যিনি ব্যারিস্টারী পাস করে পরবর্তীতে বিএনপির সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী হন তাকে মুজিবনগর থেকে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হলো।

ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে একটা চৌকস বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ এবং সাহসী বেশ কিছু মক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে টাকি থেকে দক্ষিণে বাংলাদেশের কালিগঞ্জ সীমান্ত থানার বসন্তপুরের বিপরীতে ভারতের হিংগলগঞ্জ নামক স্থানে একটা পরিত্যক্ত অটোমেটিক রাইস মিলে অপারেশন ক্যাম্প স্থাপিত হয়। যেটি সেক্টর সহঅধিনায়ক হিসেবে তার কমান্ডে সেক্টর ট্রুপস হিসেবে পরিচিত ছিল।

ক্যাপ্টেন বেগ ক্যাপ্টেন হুদার অধীনে নিজের পছন্দমতো বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে গঠিত চৌকস একটা গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলে লেঃ মইনুলের (মেজর মইন) সহায়তায় সর্বশেষ সুন্দরবনের হরিনগর-কৈইখালী এলাকায় গেরিলা অপারেশন ক্যাম্প গড়ে তুলে বৃহত্তর খুলনার বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা অপারেশন চালাতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমরকে বরিশাল এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একদল অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভোলার ছিদ্দিক, উজিরপুরের ওদুদ, আবদুল হক, জব্বারসহ বহু গেরিলা যোদ্ধা ছিল তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে বরিশাল অঞ্চলের সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে ক্যাপ্টেন শাজাহানকে 'ওমর' ছদ্মনাম দিয়ে পাঠানো হলো। ক্যাপ্টেন মেহেদীকে পটুয়াখালী জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে পটুয়াখালী অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হলো। ফরিদপুরের আরেক সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন বাবুলকে ফরিদপুরের একাংশের এলাকার সাব সেক্টর কমান্ডার এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেমায়েত উদ্দিনকে মেজর পদে উন্নীত করে ফরিদপুরের ৯নং সেক্টরের বাকি অংশের সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হলো। পিরোজপুরের কৃতী সন্তান অসম সাহসী লে. জিয়াউদ্দিনকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করে বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দরবন এলাকাসহ পিরোজপুর, মোরেলগঞ্জ ও বাগেরহাটের সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হলো। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদায় ৯নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারের এ্যাডজুটেন্ট হিসেবে এবং আমাকে ৯নং সেক্টর

হেডকোয়ার্টারের স্টাফ অফিসার হিসেবে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় দায়িত্ব প্রদান করা হলো। চট্টগ্রামের সন্তান ড. শাজাহান (যিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ আর্মি মেডিকেল কোরের মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন) তাকে মুক্তিযুদ্ধে আর্মি মেডিকেল কোরের ৯নং সেক্টরের দায়িত্ব দিয়ে টাকিতেই তাকে একটা ক্যাম্প স্থাপন করে দেয়া হলো। তাকে সহায়তার জন্য মীর কফিলউদ্দিন, নুরুল আলম বাদশা, স্বপন নামের এক কিশোরসহ মেডিকেল কোরের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ৯নং সেক্টরের প্রথম মেডিকেল ইউনিট গঠন করা হলো। ভারত-বাংলাদেশের সুন্দরবন সীমান্ত শমসেরনগর লেঃ সলিমুল্লাহর কমান্ডে একটা বেইজ ক্যাম্প গড়া হলো যা সুন্দরবন সংলগ্ন সাগর নদী মুখে পাক গানবোট চলাচলে প্রায়ই বাধার সৃষ্টি করতো।

নেভাল কমান্ড

৯নং সেক্টরে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, খুরশিদ, ফ্রগম্যান কামন্ডো ক্যাপ্টেন বেগ, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিব, আলমসহ বেশ কিছু পাকিস্তান নৌবাহিনীর অফিসার ও দুর্ধর্ষ কমন্ডো ছিলেন। তাদের পরামর্শ মতো মেজর জলিল মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে পরামর্শ করে ৯নং সেক্টরে একটা নৌবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটও ছিল। ৯নং সেক্টরের বেশির ভাগ এলাকাই ছিল নদীমাতৃক এবং এছাড়া ৯নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার 'টাকী' থেকে শুরু করে নদীপথে হিংগলগঞ্জ অপারেশন ক্যাম্প, ভারতের সুন্দরবন সংলগ্ন কৈখালি সীমানার শেষপ্রান্ত যেখান থেকে বাংলাদেশের সুন্দরবনের শুরু সেখানেও ইতিমধ্যে একটা অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করে এয়ারফোর্সের এক অফিসার সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে ঐ ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের সুন্দরবনের মুখে ঐ অপারেশন ক্যাম্পে কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত অপারেশন ক্যাম্পসহ ইতিমধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন পশুর নদীর মোহনার অভ্যন্তরে হরিনগরে ক্যাপ্টেন বেগ, লেঃ মইনুলের সহায়তায় গান বোট বিধ্বংসী কামান বসিয়ে সর্ব দক্ষিণে অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করে। ঐসব ক্যাম্পগুলোর সাথে নদীপথে যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের চাহিদা মতো অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাপ্তাহিক রেশন হিসেবে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি পৌঁছাতে নৌপথ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এসবের দিকে দৃষ্টি রেখেই এবং নৌপথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে নৌ-অপারেশন চালাতে মুক্তিযোদ্ধা নেভাল ইউনিটের স্থাপন ও প্রয়োজনীয় নৌযান সংগ্রহের দিকে নজর দেয়া হয়। খুরশিদকে ক্যাপ্টেন পদে ভূষিত করে নৌবাহিনীর আর এক অফিসার আলমের সহায়তায় ঐ নৌবাহিনীর কমান্ডের দায়িত্ব দেয়া হলো। ইতিপূর্বে ইপিআরের তিনটা টহল বোট আমাদের হস্তগত হয়েছিল। ঐ বোটগুলোকে ভারতের খিদিরপুর ডকে নিয়ে গান বোটে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত হলো। টহল বোট ৩টির

উপরে তিনটি হেভি মেশিনগান বসানো হলো এবং বোট ৩টাকে নৌ যুদ্ধের উপযোগী করে এদের নাম দেয়া হলো 'বঙ্গ বজ্র', 'বঙ্গ শার্দুল' এবং 'বঙ্গ বীর্য্য'। বোটগুলোকে গাঢ় সবুজ রঙের সাথে লাল বর্ডার দিয়ে রং করা হয় এবং নামগুলো লেখা হয়েছিল সোনালি হলুদে। হাসনাবাদঘাটে যখন এগুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করা হলো তখনই এ তিনটি বোটকে হিংগলগঞ্জ যাবার পথে ভারতের সীমান্তের মধ্যে প্রবহমান নদীতে একটা ঘাট বানিয়ে সেটাকে ৯নং সেক্টরের নৌ কমান্ড ঘাঁটি হিসেবে ব্যাবাহরের ব্যবস্থা করা হয়। সাথে সাথে ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদস্য ছিল তাদের ঐ নৌ কমান্ড ঘাঁটিতে জড়ো করে ঐ তিনটি জাহাজে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করে ওগুলোকে চলমান রাখা হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন বেগ, লেঃ তোফাজ্জলের সহায়তায় এক অসম সাহসী অভিযান চালিয়ে খুলনা গমনরত চাল ব্যবসায়ী খুলনার 'চাউলা হাসানের' চালভর্তি লঞ্চ করায়ত্ত করে ঐ নৌ ঘাঁটিতে নিয়ে আসে। চালগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার জোগাতে বেশ সহায়ক হয়েছিল এবং লঞ্চগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের নৌপথে যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরের অবকাঠামো

সেক্টর কমান্ডার
মেজর এম এ জলিল (প্রয়াত)

অপারেশন উইং
ক্যাপ্টেন এম নূরুল হুদা (হীরু)

সেক্টর সহঅধিনায়ক ও কমান্ডার, সেক্টর অপারেশনাল ট্রুপস

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন এম এ বেগ

কমান্ডার সেক্টর অপারেশনাল ট্রুপস (খুলনা) ও পরবর্তীতে কৈইখালী-হরিনগর বেইজ ক্যাম্প

কোম্পানী কমান্ডার সেক্টর অপারেশনাল ট্রুপস

লেঃ মোহাম্মদ আলী (মেজর অব.)
লেঃ আহসান উল্লাহ (মেজর অব.)
লেঃ সচীন কর্মকার (ক্যাপ্টেন অব.)
লেঃ মইনুল (মেজর অব.)
পুলিশ ক্যাডেট লিয়াকত আলী খান (মেজর অব.)
সুবেদার মেজর আব্দুল জলিল (ইপিআর)
সুবেদার লস্কর (ইপিআর)
নায়েক সুবেদার আব্দুল গফুর, কমান্ডার, ৩ ইঞ্চি মর্টার প্লাটুন (ইপিআর)
হাবিলদার এ সোবহান, গোয়েন্দা কর্মকর্তা (ইপিআর)
হাবিলদার হেমায়েত
হাবিলদার মোকাররম হোসেন (ইপিআর)
শহীদ সুবেদার ইলিয়াস (২০ আগস্ট '৭১ শ্যামনগর যুদ্ধে শহীদ)
নায়েক সুবেদার আবুল বাশার (বেঙ্গল রেজিমেন্ট) (প্রয়াত)

সাব-সেক্টর কমান্ডার ও বেইজ কমান্ডারগণ

ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর (বীরউত্তম), (মেজর অব.) সাব-সেক্টর কমান্ডার বরিশাল অঞ্চল
ক্যাপ্টেন মেহেদী আলি ইমাম (মেজর অব., প্রয়াত)
সাব-সেক্টর কমান্ডার পটুয়াখালী অঞ্চল
লেঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ (মেজর অব.) সাব-সেক্টর কমান্ডার, সুন্দরবন-পিরোজপুর-বাগেরহাট অঞ্চল
মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিন (হেমায়েত বাহিনী প্রধান), সাব-সেক্টর কমান্ডার, গোপালগঞ্জ-ফরিদপুর অঞ্চল

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল, সাব-সেক্টর কমান্ডার, মাদারীপুর-ফরিদপুর অঞ্চল
মুক্তিযুদ্ধকালীন মোজাহিদ বাহিনী ক্যাপ্টেন শাহজাহান মাস্টার, সাতক্ষীরা অঞ্চলের দেবহাটা-নাজিমগঞ্জ অঞ্চল
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ সলিমুল্লাহ, বেইজ কমান্ডার, সমশেরনগর বেইজ ক্যাম্প
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ আরেফিন (মেজর অব.), সাতক্ষীরা একাংশের বেইজ কমান্ডার

হেড কোয়ার্টার উইং

মেজর এম এ জলিল (প্রয়াত), সেক্টর কমান্ডার

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন মোঃ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, সেক্টর স্টাফ অফিসার (জি-১)
ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, এমসিএ, (প্রয়াত), সেক্টর এ্যাডজুটেন্ড
মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন সুলতানউদ্দিন (প্রয়াত), ইনডাকশন ক্যাম্প কমান্ডার ৯নং সেক্টর (বাকুন্ডিয়া ক্যাম্প)
মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন ড. শাহজাহান (মেঃ জেনারেল অব.), সেক্টর মেডিক্যাল চীফ
ড. সুফিয়া ইসলাম (ডিডি, হেলথ অব.), সেক্টর মেডিকেল অফিসার
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ বদরুল আলম, ৯নং সেক্টর নেভাল অফিসার
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ খুরশিদ, ৯নং সেক্টর নেভাল অফিসার
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ চৌধুরী, ৯নং সেক্টর নেভাল অফিসার
মুক্তিযুদ্ধকালীন লেঃ মফিজ, সেক্টর কোয়ার্টার মাস্টার
খান আলতাফ হোসেন অরুন (প্রয়াত), সেক্টর পাবলিক রিলেশনস অফিসার
স্টুয়ার্ড মুজিব, সেক্টর লিয়াজোঁ অফিসার (প্রয়াত)
নূরুল আলম ফরিদ, সম্পাদক, ৯নং সেক্টরের মুখপত্র 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' ও শরণার্থী অভ্যর্থনা কর্মকর্তা
সুবেদার মেজর সামসুল আলম, বাকুন্ডিয়া ইনডাকশন ক্যাম্প সহঅধিনায়ক
নায়েক সুবেদার মাজেদুল হক, ৯নং সেক্টর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অফিসার

রাজনৈতিক উইং

আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এমএনএ, জোনাল কাউন্সিল চেয়ারম্যান ৯নং সেক্টর এলাকা (দক্ষিণ-পশ্চিম)
নূরুল ইসলাম মঞ্জু এমএনএ, সেক্টর ইয়থ ক্যাম্প ইনচার্জ এবং প্রধান রাজনৈতিক সমন্বয়ক
এম এ গফুর এমএনএ, সহ-ইয়থ ক্যাম্প ইনচার্জ এবং তকিপুর বেইজ ক্যাম্প

পলিটিক্যাল মটিভেটর

আঃ স ম ফিরোজ, কামালউদ্দিন ফিরু, বেগম দিলরুবা হুদা, বেগম নাছির উদ্দিন, আতিয়ার রহমান, মোঃ খায়বর হোসেন।

সেক্টর স্টাফ অফিসার হিসেবে আমার করণীয় প্রতিদিনের কাজ

৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারের স্টাফ অফিসার হিসাবে আমার উপর অন্যান্য দায়িত্বের বাইরে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত ছিল তা হলো পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের চার্লি সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রতি সপ্তাহে ৯নং সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা সরবরাহকৃত সব ধরনের অস্ত্র, গোলাবারুদ, ৯নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টারসহ সকল অপারেশন ক্যাম্প ও বাকুন্ডিয়ার বেইজ ক্যাম্পের জন্য সাপ্তাহিক রেশন ও সব ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধে ব্যবহৃত ১ টনী, ২ টনী এবং ৩ টনী কাভার্ড ট্রাক দিয়ে টাকি হেডকোয়ার্টারে এনে সবগুলো ক্যাম্পে সেগুলো পৌঁছে দেয়া এবং প্রতিসপ্তাহে ভারতের বিহারের চাকুলিয়া থেকে ৬ সপ্তাহের গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলে (ঐসব) মুক্তিযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিক খাবার ব্যবস্থা করে ওদের বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়া। প্রতিদিন রাত ১২টার পর বেইজ ক্যাম্প বাকুন্ডিয়া থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকাওয়ারি মুক্তিযোদ্ধাদের যারা এফএফ নামে অভিহিত ছিল ঐসব মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দিষ্ট বর্ডার পয়েন্টে ইতিমধ্যে পাওয়া একটা বাংলাদেশী প্যাসেঞ্জার বাসে করে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। সেক্টর হেড কোয়ার্টারের কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের স্থাপনাগুলোর সর্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইতিপূর্বে গঠিত মুক্তিযোদ্ধা গোয়েন্দা বাহিনীর কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং গোয়েন্দা টিমের প্রধান পদে পাকিস্তান আর্মির ইন্টেলিজেন্সের নায়েক সুবেদার মাজেদুল হকের নেতৃত্বে গোলাম মর্তুজা মানিক, তসলিমসহ গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত বেশ কিছু তরুণকে দিয়ে বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্প, বেইজ ক্যাম্প ও পার্শ্ববর্তী রিফিউজি ক্যাম্পের এলাকায় এবং সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে গোয়েন্দা নজরদারী করা। এসব কাজ সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশমতো সম্পাদন করা এবং প্রতি সপ্তাহান্তে ব্যারাকপুরে যাবার আগে কলকাতা শহরে অবস্থিত ৮ নং থিয়েটার

রোডে অবস্থিত অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় ও প্রধান সেনাপতির দফতরে ৯নং সেক্টরের সাপ্তাহিক অপারেশনসহ সর্ববিষয়ে লিখিত রিপোর্ট পৌঁছে দিয়ে গোপনীয় লিখিত নির্দেশ সেক্টর কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করা। তখন এ কাজগুলো করতে কোন ক্লান্ত বোধ করেছি বলে মনে পড়ে না। বেইজ ক্যাম্প বাকুন্ডিয়ার প্রত্যহিক কর্মকাণ্ডের নাম ছিল 'ইনডাকসন' প্রোগ্রাম। চার্লি সেক্টর থেকে পাওয়া সব অস্ত্র গোলাবারুদ বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পের অস্ত্রাগারে ক্যাপ্টেন সুলতানের তত্ত্বাবধানে রাখা হতো।

৯নং সেক্টরে রাতের নিয়মিত কাজ

সেক্টর ট্রুপস কমান্ডার ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে এবং স্পেশাল কমান্ডো বাহিনী ক্যাপ্টেন বেগ-এর নেতৃত্বে প্রতি রাতে খুলনা এলাকায় নিয়মিত বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করতেন। এদিকে প্রতিদিন রাত ১২টার পর মেজর জলিলের জন্য হেড কোয়ার্টার থেকে বরাদ্দ একটা পুরানা টয়োটা ল্যান্ড রোভার জীপে হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকেসহ বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে যেতেন। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত মতো ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন পূর্বে উল্লিখিত ৫০ সিটের প্যাসেঞ্জার বাসে যতজন মুক্তিযোদ্ধা গোলাবারুদ ও অন্য রসদসহ বহন করা যায় তা প্রস্তুত করে রাখতেন। মেজর জলিলসহ আমরা সেখানে পৌঁছানোর পর ঐ রাতেই বাংলাদেশের ভিতরে গমনকারী নির্দিষ্ট দলটি ফলইন হয়ে অস্ত্রসহ দাঁড়িয়ে যেত। তাদের হাত খরচ হিসেবে চার্লি সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে পাওয়া পাকিস্তানি মুদ্রার নোট যা তখন 'পাক কারেন্সি' হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটা সবার মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী বেটে দিতাম। এরপর মেজর জলিল মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধাদের উদ্দেশে উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিতেন এবং যুদ্ধের সার্বিক বিষয়ে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দিকনির্দেশনা দিতেন। এভাবে রাত ১টা দেড়টা বেজে যেত। বাংলার তরুণ দামাল কমান্ডো মুক্তিযোদ্ধারা সবাই এক সাথে আমাদের সাথে শেষ কোলাকুলি করে বাসে আরোহরণের পর সবাই সমস্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে বাসটি নির্দিষ্ট সীমান্ত এলাকার দিকে যাত্রা শুরু করত। এটা হয়ে গিয়েছিল আমাদের একটা প্রত্যহিক রুটিন কাজ, এভাবে একটি দল মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকায় পৌঁছলে ভারতীয় বাহিনী পাকবাহিনীর সীমান্ত সংলগ্ন অবস্থানে পাকসেনাদের ক্যাম্পের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলিসহ মর্টার হামলা চালাত। পাকবাহিনী তখন নিজেদের সামলে ঐ গোলার আক্রমণের জবাব দিতে ব্যস্ত থাকত, এফএফ গেরিলারা এই সুযোগে পাকসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে যেত এবং আরও অভ্যন্তরে চলে গিয়ে তাদের নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে এগোতে থাকত। প্রত্যেক এফ এফ দলের একজন

কমান্ডার এবং যোগ্যতা বুঝে ডেপুটি কমান্ডার তাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার মতো সব বিষয় বিবেচনা করে নির্বাচিত হতো। এভাবে এফ এফ গেরিলাদের পাকবাহিনীর দখলে থাকা এলাকার ভিতরে ঢুকে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে গেরিলা যুদ্ধ চালাত। এটা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে 'ইনডাকসন প্রোগ্রাম' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। তবে এ প্রোগ্রাম নিয়ে বেশ কয়েকবার সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের মতবিরোধও হয়। তবে ভারতীয় বাহিনী গঠিত ৯নং সেক্টরের সহায়তাকারী চার্লি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সালেহ এবং তার অধীনস্থ অফিসাররা দেশ পাকবাহিনীমুক্ত হয়ে খুলনা শহর যৌথবাহিনীর হাতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের চাহিদামতো নিরলসভাবে সার্বিক সমর্থন দিয়ে কাজ করে গেছেন। কখনো তাদের মুখে বিরক্তির ভাব খুঁজে পাইনি। পিতৃসম ব্রিগেডিয়ার সালেহকে আজও ৩৫ বছর পর মনে পড়ে। জানি না তিনি জীবিত আছেন কিনা।

মুক্তিবাহিনী-মুজিব বাহিনী ভবানীপুরের 'সানীভিলা'

৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে মেজর জলিলের নির্দেশে যোগদানের আগে যখন তকিপুর হাইস্কুলের সেক্টরের প্রথম বেইজ ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম তখন বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ, আঃ রাজ্জাকসহ বেশ কিছু তৎকালীন আওয়ামী লীগের যুব নেতা ঐ তকিপুর ক্যাম্পে এলেন। '৬৯-৭০-এর বরিশালের ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে স্বভাবতই আমাকে তারা পেয়ে আমাকে একটা দিকনির্দেশনা দিলেন যে, ছাত্রলীগের যে সব ছেলে ৯নং সেক্টরের ক্যাম্পে আসবে তাদের যেন সেখান থেকে কলিকাতায় অবস্থিত ভবানীপুরের 'সানী ভিলা' নামের একটা দোতলা বাড়িতে, যা ভবানীপুর পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে অবস্থিত, সেখানের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেই। তখন আমাকে জানানো হলো যে, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) নামে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠিত হয়েছে যার নেতৃত্বে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আছেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং ঐ বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছে 'মুজিববাহিনী'। ভারতের টেন্ডুয়াসহ অন্যান্য ক্যাম্পে মুজিববাহিনীর সদস্যদের গেরিলা ট্রেনিংসহ রাজনৈতিক মতাদর্শের ট্রেনিং দেয়া হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রেনার এবং ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দ্বারা।

ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল 'ওবান' এ সংস্থাটির মূল ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পরের দিনই ভবানীপুরের ঐ বাড়িটিতে যেতে বলা হলো। তখন ছাত্রলীগের প্রাক্তন জেলা সভাপতি হিসেবে স্বভাবতই ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দের নির্দেশ অবজ্ঞা করার প্রশ্ন ওঠেনি। পরদিন ক্যাম্প থেকে ছুটি নিয়ে আমি ও নেভাল বাসার চললাম কলকাতার ভবানীপুরের সেই বাড়িতে। মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ছিল তা তখন থেকেই বিতর্ক থাকলেও মুজিব বাহিনী গঠনের পেছনে একটা

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এবং তা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধকালে এই মুজিব বাহিনীর পরিচালনা ভিন্নভাবে ভিন্ন কমান্ডে কতটুকু যুক্তিযুক্ত ছিল সে বিষয়ে আজও বিতর্ক বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে।

হাসনাবাদ থেকে কলকাতাগামী বাসে চেপে দুপুর নাগাদ কলকাতার ধর্মতলায় পৌঁছলাম। বাস থেকে নেমে কিসে করে জানি ভবানীপুরের পার্কের কাছে নামলাম, মনে হয় ট্রামে করে। পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে হালকা গোলাপী রং করা একটা দোতরা বাড়ি– নাম 'সানী ভিলা'। ঢুকতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলাম দু'জন সিকিউরিটির লোকের। আমি তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাই আছে কিনা জানতে চেয়ে তাদের কাছে আমার নাম বলে তাদের খবর দিতে বললাম। লোক দুটো অবাঙালি আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন এ নামের কেউ সেখানে থাকেন না। আমরাতো হতভম্ব। কলকাতার মতো অচেনা ভিনদেশের শহরে আমরা একটু থতমত খেয়ে গেলাম। লোক দুটোকে কায়দা করে জিজ্ঞেস করলাম ঐ বাড়িতে বাংলাদেশের কোন লোকজন থাকে কিনা। ওরা কি চিন্তা করে আমাদের পরখ করতে লাগল। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় দয়া হলো এই ভেবে যে, আমরা বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি) ওরা যা বলল তাতে আমাদের আক্কেলগুড়ুম। তাদের কথামতো ঐ বাড়িতে ছয় সাতজন বাবু আছেন তাদের নাম তপু বাবু, রাজু বাবু, মনি বাবু, সরোজ বাবু আর গতকাল মোটাসোটা একজন পালোয়ান এসেছে, নাম তার মধু বাবু। একটু চিন্তা করলাম, পরে মনে পড়ল ওনারা বোধহয় ওখানে ছদ্মনামে থাকেন। হিসেব করে মেলালাম যে, তপু বাবু মানে তোফায়েল ভাই, রাজু বাবু মানে রাজ্জাক ভাই, সরোজ বাবু মানে সিরাজুল আলম খান, মণি বাবু মানে মণি ভাই আর মধু বাবুর যা চেহারার বর্ণনা ছিল তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এ নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মুন্সীগঞ্জের মহিউদ্দিন। যা হোক বহু কায়দায় তাদের খবর পাঠিয়ে অবশেষে বাড়িটাতে প্রবেশের অনুমতি মিলল। এটাই হলো ভবানীপুরে অবস্থিত (কিছুদিন আগে প্রয়াত) চিত্ত সুতারের কলকাতার বাড়ি 'সানী ভিলা'। যেখানে এই এলাকার মুজিববাহিনীর অস্থায়ী সুতিকাগার হিসাবে প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়। দোতলায় উঠে গিয়ে তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাই, নিচতলায় সিঁড়িঘরের কাছে একটা মশারি টাঙ্গিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় সিরাজুল আলম খান ও মহিউদ্দিনদের পেলাম। আমাদের দু'জনকে দু'দিন থাকতে বলা হলো নিচতলার একটা ঘরে দুটো চৌকিতে। আমার শরীর

তখন মহিউদ্দিনের মতো মোটাসোটা থাকায় আমাকে মহিউদ্দিনের ভাই মন্টু বাবু নাম দেয়া হলো। বাড়ির দোতলায় একটা কক্ষে তোফায়েল ভাই. রাজ্জাক ভাইসহ আরও কয়েকজন আমাকে নিয়ে বৈঠক করলেন। ঐ বৈঠকে বসে জানলাম যে, আগরতলায় শেখ ফজলুল হক মণিসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও কৃষক লীগের ভারতে আগত সদস্যদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আগরতলাতে হেডকোয়ার্টার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নাকি বেশ কয়েক হাজার মুজিব বাহিনীর সদস্য ভারতের পার্বত্য দুর্গম এলাকা টেন্ডুয়াতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ট্রেনিং নেয়া আরম্ভ করেছে। যাহোক নেতৃবৃন্দ আমাকে মুজিববাহিনী (বিএলএফ)-এর বরিশাল জেলার কমান্ডার হিসেবে মুজিব বাহিনীর পরিচালনার জন্য টেন্ডুয়াতে গিয়ে ট্রেনিং নিতে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। বললাম ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের অনুমতি ব্যতিরেকে এটা মনে হয় করা সম্ভব হবে না। যা হোক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপের কাছে নতি স্বীকার করার অবস্থা। তখন বেলা ৩টার মতো হবে আমরা আগের রাতের মতো দুপুরে খেয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। হঠাৎ করে নিচতলা থেকে খবর পেলাম যে নিচে বরিশালের আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এসেছে। (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের চিফ হুইপ ও আওয়ামী লীগের বরিশাল অঞ্চলের বড় নেতা)। হঠাৎ যেন পায়ে মাটি পেলাম। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ উপরে এলেন। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি। তিনি আসতেই আমি প্রস্তাব দিলাম মুজিববাহিনীর বরিশাল জেলার কমান্ডার হিসেবে তাকে নির্বাচিত করা হোক। হাসনাত সাহেবও প্রস্তাবটির ব্যাপারে দ্বিমত করলেন না। নেতৃবৃন্দও হাসনাতকে পেয়ে তার বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। কোনমতে ঐদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুজিববাহিনীকে (বিএলএফ) সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগ রাজনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ার পরিকল্পনা নেতাদের ছিল। আলোচনাকালে জানতে পারলাম মুজিববাহিনী (বিএলএফ)-র সদস্যগণ টেন্ডুয়াসহ অন্যান্য ক্যাম্প থেকে অস্ত্রের ও গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যে অঞ্চলমুক্ত করবে ঐ এলাকায় তারা অবস্থান নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে দেশে যাতে একটা রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত বাহিনী (ক্যাডার) তৈরি হয় এবং মুক্ত এলাকাগুলোতে রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রশাসনিক সামাজিক নেতৃত্ব যাতে মুজিব বাহিনীর আয়ত্তে থাকে এবং দেশ স্বাধীন হলে যেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় দেশের এলাকাভিত্তিক একটা একক রাজনৈতিক শক্তি গড়ে

ওঠে সে নিয়েই মুজিববহিনী গঠিত হয়েছে। মুজিববাহিনীর যোদ্ধারা বেশ কিছু সাফল্যজনক অপারেশনে এককভাবে অংশ নেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিববাহিনীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। সিরাজুল আলম খান, আ স ম রব বিপ্লবী ছাত্রনেতা স্বপন কুমার, মার্শাল মণি, আ ফ ম মাহাবুব গংয়ের সাথে মুজিববাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাই, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শেখ শহিদসহ নেতৃবৃন্দ অংশের কিছু মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমি মনে করি স্বাধীনতার পর মুজিববাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামধারী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বের সূচনা ওখান থেকেই। যা হোক এটা তত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি মুক্তিযুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে, যারা তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারসহ ফ্রন্টে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিএলএফ (মুজিব বাহিনীর) দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতো। এটা হয়েছিল উপর থেকে সমন্বয়ের অভাবে। আমাকে ৯নং সেক্টরের আওতাধীন আগত ছাত্রলীগের ছেলেদের ভবানীপুরের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সেখানে পাঠানোর দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হলো। পরদিন সকালেই মুক্তিযুদ্ধের একটা নতুন ধারার ধারণা নিয়ে ৯ নম্বর সেক্টরের তকিপুর ক্যাম্পে চলে এলাম। সেখান থেকে মেজর জলিলের নির্দেশে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যেভাবে স্থান পেলাম তা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি।

৯নং সেক্টরের গেরিলা যুদ্ধ

৯নং সেক্টরের নেতৃত্বে বিহারের চাকুলিয়া থেকে ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে আসা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে প্রেরিত শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিরাতে দলে দলে বিভক্ত করে বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্প থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ ও পাক কারেন্সি দিয়ে পাকবাহিনীর দখলকৃত ৯নং সেক্টরের আওতাধীন এলাকায় প্রেরণ আরম্ভ হলো। প্রতি রাত ১২টার পর এটা হয়ে উঠেছিল আমাদের একটা রুটিন মাফিক কাজ যা আগেই বর্ণনা করেছি। এটাকে 'ইনডাকশন' নামে অভিহিত বহুল প্রচারিত হয়ে ৩/৪ মাসের মধ্যে ইন্ডাকসনের মাধ্যমে কয়েক হাজার এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) গেরিলা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৯নং সেক্টর এলাকায় ঢুকে গিয়ে অপারেশন শুরু করল, ৯নং সেক্টর এলাকায় বিভিন্ন সাব-সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্বে। কয়েক মাসের মধ্যে এই উপায়ে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি সর্বমহলে প্রশংসিত হলো। পাকবাহিনীও এদের হামলায় পর্যুদস্ত হতে লাগল।

৯নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ মূলত এফএফ গেরিলা যোদ্ধাদের দিয়ে পরিচালিত হয়। এরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে নির্দেশমতো তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রথমে অবস্থান নিতো। পরবর্তীতে ঐ এলাকার সাব-সেক্টর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট এলাকায় সমন্বিত উপায়ে অপারেশন চালাতো। এসব যোদ্ধাদের সহায়কশক্তি ছিল স্থানীয় বিভিন্ন পেশার জনগণ। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা এলাকায় অবস্থান সুসংহত করতো। এসব এফএফরা আবার স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সাথে নিয়ে অপারেশন চালাতো। এভাবে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে ৯নং সেক্টর এলাকার কতিপয় দালাল ব্যতীত সবাই মুক্তিযোদ্ধাতে পরিণত হলো তাদের কার্যাবলী দ্বারা।

এফএফ দলগুলোর সাথে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও গোয়েন্দা তৎপরতা

ইনডাকশনের সময় প্রত্যেকটি এফএফ দলকে নির্দেশনা দেয়া হতো যে তারা তাদের এলাকায় পৌঁছে ঐ এলাকা যে সাব-সেক্টর কমান্ডারের আওতাধীন, যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের সাথে যেন যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের নির্দেশনা অথবা তাদের জ্ঞাতসারে অবস্থান নেয় বা সরাসরি তাদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের কমান্ডে যুদ্ধ চালায়। বরিশালের সাব-সেক্টর কমান্ডার সাহজাহান ওমর, ফরিদপুরের বাবুল এবং মেজর হেমায়েত উদ্দিন বীরবিক্রম, পিরোজপুর বাগেরহাটের জিয়াউদ্দিন এবং পটুয়াখালীর মেহেদীর সাথে যোগাযোগের জন্য গৌরনদীর বিচ্ছু আলম প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই বিচ্ছু আলম ৯নং সেক্টরের কত বড় গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা কাজে জড়িত ছিল তা দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে অনেকেই জানত না। বিচ্ছু আলম প্রায় প্রতিসপ্তাহেই বিভিন্ন সাব-সেক্টর কমান্ডারদের সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে নিয়মিত ৯নং সেক্টর এলাকার সব ধরনের গেরিলা অপারেশনের খবরসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যসহ পাকবাহিনী ৯নং সেক্টর এলাকার কোথায় কি অবস্থানে থাকতো সে খবর সঠিকভাবে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌছাতো। বিচ্ছু আলম তার এ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামের সাধারণ লোকদের ব্যবহার করত। বিচ্ছুর গোয়েন্দা তথ্য এতই নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল যে, ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনায় এই সরবরাহকৃত সংবাদ গুরুত্ব পায়। অসমসাহসী ১৩/১৪ বছরের হাফপ্যান্ট পরা কালো লিকলিকে ছেলেটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি দেশ স্বাধীন হবার পর সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি এবং ওর ভাগ্যে জুটেছিল চরম অবহেলা। যখন এ কাহিনী লিখছি তখন বিচ্ছু আলমের খোঁজ আমার কাছে নেই। তবে বছরখানেক আগে ছেলেটা রোগাক্রান্ত অর্ধউন্মাদ এবং আর্থিকভাবে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমার কাছে এসেছিল। জানি না এ রকম কতো বিচ্ছু আলমরা আজ বাংলাদেশের পথেপ্রান্তরে ওর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনবাজি

রেখে এ সময়ে এ নাবালক ছেলেটা যা করেছিল তার প্রতিদানে ওর কপালে স্বাধীন বাংলাদেশে চরম অবহেলার প্রেক্ষিতে ক্ষুধা আর মানসিক ব্যাধি জুটেছে। সুন্দরবনের মোরেলগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় আয়জুদ্দিন নামে একজন কালো টাকপড়া খাটোমতো লোক ছিলেন। তিনিও গোয়েন্দা কাজে জড়িত ছিলেন এবং তার ৫/৬ খানা নৌকা দিয়ে এফএফ ছেলেদের বাংলাদেশের ভিতর নিয়ে যেত আবার মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে আগত ছেলেদের নিয়ে আসত আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। মূলত সে সুন্দরবনের মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন এলাকায় গোয়েন্দা কাজে জড়িত ছিল বেশি। স্বাধীনতার ৩/৪ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে পাকবাহিনীর অত্যাচার আর তরুণ ছেলেদের নিধনের কারণে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুনরা বর্ডার পেরিয়ে আসতে লাগল। আমাদের সাথে ভারতীয় কমান্ডের ব্যবস্থা অনুযয়ী এক সময় আরও ট্রেনিংয়ে পাঠানো এবং অস্ত্র দিয়ে দেশের ভিতর পাঠানোর চেয়ে বেশিসংখ্যক ছেলের আসা আরম্ভ হওয়ায় বাড়তি ছেলেদের তারা ট্রেনিং ও অস্ত্র প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। মেজর জলিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমরা যারা কর্মরত অফিসার ছিলাম তাদের সাথে পরামর্শ করে বাংলাদেশের মধ্যে বর্ডার এলাকায় ইতিমধ্যে মুক্ত দেবহাটা থানা হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন একটা স্কুলে সর্বপ্রথম গোপনে বাড়তি ছেলেদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য একটা ক্যাম্প স্থাপন করলেন। ঐ ক্যাম্পে ইনডাকশন প্রোগ্রামের অস্ত্রশস্ত্র থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে এবং রাজাকারদের নিকট থেকে সময় সময় পাওয়া অস্ত্র একত্রিত করে ওখানে পাঠানো হতো। ট্রেনিং ক্যাম্পটি আমারই তত্ত্বাবধানে ও সার্বিক দায়িত্বে পরিচালিত হয়। ট্রেনিং শেষে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের নির্দেশে ঐ সব ছেলেকে তাদের নিজেদের এলাকায় পাঠিয়ে দিতাম।

অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন ও সম্মুখ যুদ্ধ

অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন ও প্রতিরাতে বাংলাদেশের মধ্যে অপারেশন পরিচালনার জন্য ৯নং সেক্টর আওতাভুক্ত বাংলাদেশের বর্ডার এলাকার অপরদিকে (ভারতীয় প্রান্তে) অপারেশন ক্যাম্প কালিন্দি নদীর (যা ইছামতি নামে বহুল পরিচিত) পাশ ঘেঁষে স্থাপন করা হয়। যার মধ্যে শক্তিশালী অপারেশন ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয় হিংগলগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের কাছেই একটা পরিত্যক্ত স্বয়ংক্রিয় চালকলের চত্বরে। ২/৩শ'র মতো সাহসী বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য, ইউওটিসিও ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে এটা স্থাপন করা হয়। তাদের রেশন, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখিত রূপান্তরিত গানবোটে অথবা সড়কপথে টেম্পো দিয়ে রাতে রাতে নিয়মিত পৌঁছে দিতাম। ক্যাপ্টেন (অব.) নূরুল হুদা (নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সেঝ ভাই) ঐ ক্যাম্পের কমান্ডার ও তিনি ৯নং সেক্টরের সহকারী সেক্টর কমান্ডার যাকে আর্মি ভাষায় বলা হয় সেক্টর টোআইসি, হিসেবে যুদ্ধ করেছেন। প্রতিরাতে ক্যাপ্টেন হুদা নিজে অথবা পাক নৌবাহিনীর নৌ কমান্ডো ফ্রগম্যান কমান্ডো ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ নদী পাড়ি দিয়ে সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ৯নং সেক্টরের অপারেশনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ ক'টি অপারেশন চালিয়েছেন, যা পাকসেনাদের বর্ডার এলাকার প্রতিরোধ ভেঙে দেয় এবং মানসিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বর্তমান সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানা সম্মুখযুদ্ধে দখল কিন্তু পরে পাকবাহিনীর জোরালো প্রতি আক্রমণে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার শহীদের বিনিময়ে দখল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। গাবুরার রাজাকার ঘাঁটি ধ্বংস ও নির্মূল, কালিগঞ্জ থানা আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডের পাকবাহিনী শক্ত বিওপি উকসা দখল এবং পরবর্তীতে দেবহাটা থানা ও খাইঞ্জাপুর বিওপি পাকবাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস ও দখলমুক্তসহ পারুলিয়া ব্রিজ ক্যাপ্টেন বেগের ফ্রগম্যান অপারেশনের মাধ্যমে উড়িয়ে দিয়ে লাগাতার যুদ্ধের পরে ব্রিজটি দখল এবং সাতক্ষীরা দখলের পূর্বে কুলিয়া ব্রিজের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দেবহাটা হাই স্কুলের শিক্ষক শাহজাহান মাস্টার ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরেই স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে দেবহাটা এলাকায় এক অসম সাহসী মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলেন। ৯নং সেক্টরের বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন শাহজাহন মাস্টারের বাহিনী দুর্জয় সাহসের সাথে বেশ ক'টি যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন বেগ একটি দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী তৈরি করে গানবোট বিধ্বংসী কামান নিয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন হরিনগরে শক্তিশালী অপারেশন ক্যাম্প স্থপন করে পাকবাহিনীর বেশ কটি গান বোটের উপর হামলা চালিয়ে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করেন। তার সহকরী হিসাবে সাহসী ভূমিকা পালন করে লেঃ মইনুল (মেজর মইন) এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক বাশার (প্রয়াত)। কৈখালীতে সুন্দরবন সংলগ্ন ভারতীয় সীমান্তের সর্বশেষ স্থানে লেফটেন্যান্ট সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে একটা অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করা হলে ঐ বাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনীর বেশ কয়েকটি গানবোট আক্রান্ত হবার পরে ওদিকে গানবোট আসা বন্ধ করে দেয়। সুন্দরবনের ভিতর কুখ্যাত ডাকাত পচাব্দী ফকির তার বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রসহ লে. সলিমুল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং পরে তারা সলিমুল্লার নেতৃত্বে কৈখালী অপারেশন ক্যাম্পের বাহিনী হিসাবে যুক্ত হয়ে পাকবাহিনীর গানবোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেশ সফলতা লাভ করে।

অসম সাহসী ৯নং সেক্টরের গেরিলা কমান্ডার ক্যাপ্টেন বেগ খুলনার সাতক্ষীরা অঞ্চলে সেক্টরের সর্বাধিক গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধের অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়ে পাকবাহিনীর নিকট যমদূত নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ৯নং সেক্টরের আওতাধীন বরিশাল জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার বর্তমানে ব্যারিস্টার সাজাহান ওমর (পরবর্তীতে বিএনপির এমপি এবং সাবেক জোট সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী) সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে দায়িত্ব নিয়ে সাব সেক্টর কমান্ডার হিসাবে সমগ্র বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে সর্বপ্রথমে উজিরপুরের বড়াকোটা স্কুলে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে সমগ্র পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাদের নিকট আর এক আতঙ্ক হয়ে ওঠেন। সম্মুখ যুদ্ধে সশরীরে নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের শেষ দিকে সাজাহান ওমর (বীরউত্তম) পায়ে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েও স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বরিশালের সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসাবে অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। হেমায়েত বাহিনী ছিল ফরিদপুর অঞ্চলের পাকবাহিনীর নিকট ত্রাস, তার কমান্ডার মেজর হেমায়েত (বীরবিক্রম) নেতৃত্ব দেন, ওই এলাকার ৯নং সেক্টরের সাব-সেক্টর

কমান্ডার হিসাবে। অসংখ্য যুদ্ধে সশরীরে নেতৃত্ব দিয়ে গালে পাকবাহিনীর গুলি লেগে আহত হন। কিন্তু স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। পটুয়াখালী অঞ্চলের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর মেহেদী ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বেশ সাফল্য লাভ করেন। যুদ্ধে অংশ নেন বর্তমান জাসদ নেতা হিরু তার অন্যতম সহকারী হিসাবে। অসম সাহসিকতার সাথে সুন্দরবন সংলগ্ন বাগেরহাট, খুলনা এলাকায় সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিনের (পরে মেজর হয়েছিলেন) নেতৃত্বে তার হাতেগড়া দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী পাকবাহিনীর গানবোটের বিরুদ্ধে এবং আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্মুখযুদ্ধে সফলতার সাথে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের নারীমুক্তি যোদ্ধাবাহিনী গঠন করে তাদের দিয়ে বেশ কিছু সফল অপারেশনও করিয়েছেন তিনি।

নৌ-কমান্ডো বাহিনী– অপারেশন মংলা

মে মাসের মাঝামাঝি খুলনার রহমতউল্লা দাদুর নেতৃত্বে ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নৌ কমান্ডো ট্রেনিং এর পর ভারতীয় নৌবাহিনীর সহায়তায় নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হলো। এরা ভারতের মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক পলাশীতে ভাগিরথি নদীর ধারে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর থেকে আগতদের ফ্রমম্যান ট্রেনিং দিয়ে পাকবাহিনী দখলকৃত চট্টগ্রাম, মংলা সমুদ্রবন্দরে নোঙর করা সমুদ্রগামী জাহাজসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীবন্দরগুলোয় নোঙরকৃত জাহাজ এবং বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য নৌযানের নিচে লিমপেট মাইন লাগিয়ে তা ব্লাস্ট করে ওইগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে সমুদ্রবন্দর দু'টিসহ অন্যান্য নৌবন্দর ব্যবহারের অনুপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ট্রেনিং শেষে বাশারসহ (নেভাল বাশার নামে পরিচিত) শ্যামনগরের ২৪ জন ছেলেসহ মোট ৩৪ জন নৌ-কমান্ডো ট্রেনিং নিয়ে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে এলো। তাদেরকেও বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিনের কমান্ডে পাঠানো হলো। বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পের জমিদার বাড়ির সম্মুখে একটা দীঘি ছিল। ক্যাপ্টেন সুলতান পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরিতে থাকাকালে আমেরিকা থেকে ফ্রগম্যানশীপ ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাকনেভীর নামকরা নৌ-কমান্ডো ছিলেন। তিনি ঐ দীঘিতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডোদের সাথে আরও কিছু ইচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধাকে ফ্রগম্যান ট্রেনিং দিতে থাকেন। এরা ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিনের সহযোগিতায় অল্প দিনেই একটা দুর্ধর্ষ নৌ-কমান্ডো বাহিনীতে পরিণত হলো। ভারতীয় বাহিনীর চার্লি সেক্টরের সমন্বয়ে সাব-সেক্টর কমান্ডার লেঃ জিয়াউদ্দিনের তদারকি ও সহায়তায় এদের দিয়ে ৯নং সেক্টর এলাকাধীন মংলাবন্দরে নোঙর করা পাকবাহিনীর ব্যবহৃত জাহাজসহ কয়েকটি বিদেশী নোঙরকৃত সমুদ্রগামী জাহাজ ডুবিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হলো। জাহাজ ডোবানোর জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লিমপেট মাইন এসে গেল। এগুলো দেখতে কচ্ছপের পিঠের আকারের হেলমেটের মতো। এর কার্যকারিতা ফ্রগম্যান নৌ কমান্ডোরা শিখে

নিলো অল্প কিছু দিনে। অপারেশনের দিন ১৫ আগস্ট '৭১ সন্ধ্যার পর নির্ধারণ করে সকল ফ্রগম্যান নৌ কমান্ডো মংলা বন্দরের অভিমুখে লেঃ জিয়াউদ্দিনের বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলো। অপারেশনকালে এদেরকে প্রয়োজনে ফায়ার সাপোর্ট দেবার জন্য খুলনার খিজির, আফজাল ও আনোয়ার নামে তিন অসম সাহসী কমান্ডারদের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধাদের একই সাথে লেঃ জিয়াউদ্দিনের সাথে মংলা পাঠানো হলো। সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে বুড়ি গোয়ালিনী ফরেস্ট রেঞ্জ হয়ে তারা ৫টা নৌকা নিয়ে পশুর নদীতে মংলাবন্দরের উল্টা দিকে অবস্থান নিলো। পূর্ব পরিকল্পনা মতে ফ্রগম্যানরা প্রত্যেকের বুকে লিমপেট মাইন ও জাহাজের তলার শ্যাওলা পরিষ্কার করে চুম্বক শক্তিসম্পন্ন ওই মাইন লাগানোর জন্য ফ্রগম্যান বেয়োনেট নিয়ে পায়ে ফ্রগম্যানদের ব্যবহারের জন্য অনায়াসে ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজের কাছে যাবার জন্য রবারের ব্যাঙের পায়ের মতো ফ্রগম্যান ফুটওয়্যার পরে নিলো। ১৪টি জাহাজ ভিড়ানো মংলা থেকে হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত। দু'জন করে ফ্রগম্যান এক একটা জাহাজ নির্দিষ্ট করে ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল। ওদের ফায়ার কভার দেবার জন্য কমান্ডার খিজির, আফজাল ও আনোয়ারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা মংলাবন্দরের পশুর নদীতে নোঙরকৃত জাহাজগুলোর কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। নৌ-কমান্ডোরা দু'জন করে প্রতিটি জাহাজের মাঝ বরাবর ডুব দিয়ে জাহাজের তলদেশে তাদের সাথে থাকা বেয়নেট দিয়ে শ্যাওলা আঁচড়িয়ে ফেলে চুম্বকযুক্ত লিমপেট মাইনগুলো লাগিয়ে সেফটি পিন খুলে ট্রেনিংমতো ব্যাক স্ট্রোক সাঁতার দিয়ে জাহাজগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এলো। লিমপেট মাইনের ডেটনেটরের সেফটি পিনগুলো খুলে ফেলার সাথে সাথে সেখানে পানির চাপ পড়তেই লিমপেট মাইনগুলো এক একটা করে সবগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকল। মাইনের বিস্ফোরণে জাহাজগুলোর তলদেশ ফেটে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৬/৭টা জাহাজ ডুবে গেল। পাকবাহিনীর যারা ঐ জাহাজগুলোতে পাহারায় ছিল তাদের অনেকেই পশুর নদীতে লাফিয়ে পড়ে ডুবে মরল। মংলা বন্দরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থানরত পাকবাহিনী দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে গোলাগুলি ছুড়তে লাগল। কমান্ডার খিজির, আফজাল ও আনোয়ারের বাহিনীও গোলাগুলির জবাব দিতে থাকলো, কমান্ডোদের বিনা বাধায় তীরে লাগানো নৌকাগুলোতে পৌছানো পর্যন্ত এই ফায়ার সাপোর্ট চললো। সুনীল বড়ুয়া নামে এক কমান্ডো পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও তার বুদ্ধিবলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে মুক্ত হয়ে পাড়ে ফিরে আসে।

অল্প সময়ের মধ্যে নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন শেষ করে তীরে ফিরে এলে তাদের নিয়ে আমাদের বাহিনীর কমান্ডারদের নেতৃত্বে সুন্দরবনের মধ্যে চলে যাওয়া ছোট খালে ঢুকে সকালের আগেই ফিরে এলো লেঃ জিয়াউদ্দিনের সুন্দরবন ঘাঁটির নির্ধারিত স্থানে। সেখান থেকে তাদের সেক্টরের বেইজ ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হলো। এ অভাবনীয় সাফল্যের ফলে পাক সরকারসহ ঐ অঞ্চলের পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। পরদিন দুপুরের মধ্যে আকাশবাণী থেকে সর্বপ্রথম মংলা বন্দরের সফল নৌ-কমান্ডো অপারেশনের খবর প্রচার করল। সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও একই খবর প্রচারিত হলো। সারা বিশ্বে সেদিন মুক্তিযোদ্ধদের এই অপারেশনের খবর ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় এ অপারেশনের কাহিনী ছাপল। নৌ-কমান্ডোদের এ সফল অভিযান ৯নং সেক্টরের গেরিলা অভিযানের সামর্থ্যের খবরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে চমৎকৃত করল। এরপরে এ ধরনের আরও বেশ ক'টি অপারেশন ৯নং সেক্টর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নদীবন্দরেও সফলভাবে পরিচালিত হয়। যৌথবাহিনীর পরিকল্পনা মতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরেও একই সময়ে ঐ এলাকায় প্রেরিত নৌ-কমান্ডোরা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে কর্ণফুলী নদীমুখে কয়েকটি সমুদ্রগামী জাহাজ একই কায়দায় ডুবিয়ে দেয় ফলে দেশের দুটো সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে যাতে পাকবাহিনী বেশ বড় রকমের ধাক্কা খেয়ে তাদের মনোবল অনেকটা ভেঙে যায়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ফ্রগম্যানরা এরপর বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি নদীবন্দরে একই কায়দায় কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে বেশ ক'টি নৌযান ডুবিয়ে দেয়। বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে নৌ-কমান্ডো বাশারের নেতৃত্বে এ ধরনের সফল অপারেশন চালানো হয় নোঙরকৃত পাকবাহিনীর ব্যবহৃত নৌযান ডুবিয়ে দিয়ে। এই নৌ-কমান্ডোদের ফ্রগম্যান অপারেশনের একটা ফললাভ হলো আমাদের ৯নং সেক্টর এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে। ৯নং সেক্টর এলাকার বেশির ভাগ এলাকা ছিল নদীমাতৃক। এর আগে এসব এলাকায় গানবোটের নেতৃত্বে ২/৩টা লঞ্চ পাকবাহিনী নিয়ে নদী তীরবর্তী এলাকায় আক্রমণ চালাত অহরহ। এই নৌ-কমান্ডোদের অপারেশনের পর গানবোটসহ নৌযান নিয়ে পাকবাহিনীর অহরহ অপারেশন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময়ে পাক নৌবাহিনীর ফ্রগম্যান গেরিলা কমন্ডার ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ ৯নং সেক্টরের সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন বেশ ক'টি পাকবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত রাস্তার ওপর স্থাপিত ব্রিজগুলো প্রবাহিত খালের মধ্য দিয়ে সঙ্গীয় নৌ-

কমান্ডোদের নিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে ঐসব ব্রিজ, কালভার্ট উড়িয়ে দেবার সফল অপারেশন চালান। এর মধ্যে পাকবাহিনীর ব্যবহৃত সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা সড়কে অবস্থিত পারুলিয়া ব্রিজটি কমান্ডো কায়দায় হাই এক্সপ্লোসিস দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনীর সাতক্ষীরা থেকে গাড়িযোগে কালিগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। একই পদ্ধতিতে যৌথ বাহিনীর সিদ্ধান্তে ৯নং সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরেও একইভাবে বেশ ক'টি পাকবাহিনীর ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ কালভার্ট উড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে পাকবাহিনীর '৭১-এর অক্টোবরের শেষ দিক দিয়ে সরাসরি গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অবাধ যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় এবং নভেম্বর মাস থেকে ৯নং সেক্টর এলাকায় পাকবাহিনী সড়কপথে সরাসরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা শুধু তাদের দখলীকৃত নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত তাদের অবস্থানস্থলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এসব এলাকার অধিকাংশ রাজাকার মারা পড়ে, কেউ কেউ পালিয়ে যায় এবং বেশির ভাগই আত্মসমর্পণ করে। অক্টোবর মাসের দিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও পাকবাহিনীর অবাধ বিচরণে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্রিজ, কালভার্ট উড়িয়ে দেবার কারণে। ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর অহরহ ব্যবহৃত রাস্তাগুলোতে মাইন পেতে বেশ কিছু পাকবাহিনী বহনকারী কনভয় উড়িয়ে দিয়ে ওদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে। ক্যাপ্টেন বেগ একই কায়দায় ৯নং সেক্টরের খুলনা সাতক্ষীরা এলাকায় এ ধরনের বেশ কিছু সফল গেরিলা অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করে। সাতক্ষীরার কপিলমুনি এলাকাসহ সংশ্লিষ্ট আসাসুনী ও তেরোখাদা এলাকার নদীপথসহ সর্বত্র লেফটেন্যান্ট আরেফিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কিছু সফল অপারেশন করে। লে. আরেফিনকে এক যুদ্ধে পাকবাহিনী বন্দী করে তাদের ব্যবহৃত গানবোটে তাকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবার সময় আরেফিন জীবনবাজি রেখে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাকবাহিনীর গানবোট থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং ডুবন্ত অবস্থায় হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ডুব সাঁতার দিয়ে কপিলমুনিতে নদীর তীরে উঠতে সক্ষম হয়। দেশ মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত লে. আরেফিন ঐ এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রাখমে সমর্থ হয়।

৯নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডারদের সাহসী নেতৃত্বে বেশ কিছু গেরিলা অপারেশনে এবং পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পাক গানবোটসহ পাকবাহিনীর ব্যবহৃত নৌযান রাস্তায় চলাচলরত পাকবাহিনী ভর্তি ট্রাকগুলোকসহ পাকবাহিনীর

বিভিন্ন অবস্থান ও স্থাপনার ওপর সফল হামলা পরিচালিত হয়। বিশেষ করে বরিশালের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর সাজাহান ওমর, ফরিদপুরের একাংশের সাব-সেক্টর কমান্ডার হেমায়েত বাহিনীর প্রধান মেজর হেমায়েতের নেতৃত্বে, ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন মাহাফুজ আলম বেগের এবং লে. আরেফিনের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা এলাকায়, লেঃ জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন এলাকা সংলগ্ন বাগেরহাট পিরোজপুর এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দেন। পটুয়াখালী জেলা এলাকার সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে পটুয়াখালী জেলা এলাকায় এবং ইতিমধ্যে ইনডাকসনের মাধ্যমে ৯নং সেক্টর এলাকায় প্রেরিত গেরিলারা যার যার এলাকার সাব-সেক্টর কমান্ডারদের সাথে যোগ দিয়ে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের নির্দেশে পাকবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানে হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে এবং অ্যামবুশের মাধ্যমে ৯নং সেক্টর এলাকায় অবস্থানরত পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাদের অবস্থানস্থলের মধ্যে কোণঠাসা করে অবরুদ্ধ করতে থাকে। ফলে ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলেও ৯নং সেক্টর এলাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ থানা ও জেলা হেডকোয়ার্টার বিশেষ করে বরিশাল শহর ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এসে সেগুলো শত্রুমুক্ত এলাকা হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টর এলাকর প্রতিটি স্থানের বসবাসকারী সাধারণ আপামর জনতা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্যসহ আমাদের তৎকালীন সময়ে অব্যাহত সক্রিয় সহযোগিতা করে এমনকি এরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের পথ চলায় সাহায্যসহ গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে পাকবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকবাহিনীর সঠিক খবর প্রদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরিত সকল সংবাদ অন্য মুক্তিযোদ্ধা দলের কাছে সফলভাবে পৌঁছে দিত। ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখের পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধারা বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনার বেশ কিছু পাকবাহিনীর হেডকোয়ার্টারসহ উক্ত এলাকার উল্লেখযোগ্য এলাকা দখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়। মুক্ত এলাকা সৃষ্টি হতে থাকে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন সাজাহান ওমর, মেজর জিয়াউদ্দিন, মেজর হেমায়েত উদ্দিন, ক্যাপ্টেন মেহেদী, ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন মাহাফুজ আলম বেগ-এর নেতৃত্বে। উল্লিখিত অকুতোভয় ৯নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডারসহ অন্যান্য ইউনিট কমান্ডার, বেইজ কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল যুদ্ধে অসম সাহসিকতার সাথে সফল অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ সবিস্তারে লিখতে গেলে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার

বীরগাথা একেকটা বড় বড় বইয়েও সংস্কুলান হবে না। মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরের সবগুলো অপারেশনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সেক্টর হেডকোয়ার্টারের স্টাফ অফিসার হিসেবে দাপ্তরিকভাবে আমার অবগতিতে ছিল তথাপি তা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এ ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব আমি নিজ কাঁধে নিয়ে ৯নং সেক্টরের অকুতোভয় সকল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আজ ক্ষমাপ্রার্থী।

বরিশাল সাব-সেক্টরের যুদ্ধকথা

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সেক্টর সহঅধিকায়ক নূরুল হুদা (হিরু)র সহায়তায় ৭৫ জনের একটি দুর্ধর্ষ গেরিলা দল গঠন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে এক দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত করে ৯নং সেক্টরের বরিশাল সাব-সেক্টর বাহিনী। এই বাহিনী '৭১-এর আগস্টের ২০ তারিখ বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার কথা থাকলেও পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ৭ জন তরুণ অফিসারের মধ্যে একজন (ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর)কে এ দলের প্রধান করে সঙ্গে দেয়া হয় এবং ৭৫ জন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে যশোরেরর বাগদা বর্ডার দিয়ে ২১ আগস্ট ১৯৭১ প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ঝিকরগাছা, কালিগঞ্জ, কোলা, মাগুরা হয়ে পরাণপটুর (যশোর), ভেন্নাবাড়ী (ফরিদপুর), নারিকেল বাড়ী ও মশাং হয়ে ২৫ আগস্ট ভবাবানীপুর মিস্ত্রি বাড়িতে রাত্রি যাপন করে এ দলটি। এই সময় মজিদ খানের বাহিনী ও রতন শরীফের বাহিনী এই সাব-সেক্টরের ট্রুপস এর সাথে মিলিত হয়। পরদিন ২৬ আগস্ট (উজিরপুর থানা) বড়াকোঠা দরগা বাড়ির স্কুলে বরিশাল সাব-সেক্টরের প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করে সর্বপ্রথম এখান থেকে ক্যাপ্টেন শাহাজাহান ওমরের নেতৃত্বে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সকল মুক্তিযোদ্ধার আহ্বান জানিয়ে সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টারের সাথে একত্র হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে বৃহত্তর বরিশালকে মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করা হয়। ৭৫ জনের বাহিনী কর্তৃক আনীত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে থানায় থানায়, এলাকায় এলাকায় বেইস গঠনর করে বেইস কমান্ডারের মাধ্যমে ৩৪টি বেইজের স্বীকৃতি দেয়া হয়। যে সব কমান্ডারকে বেইস কমান্ডার করা হয়েছিল তারা হলো :

বৃহত্তর বরিশাল জেলা নিয়ে বরিশাল সাব সেক্টর গঠন ও পুনর্বিন্যাস

	থানার নাম	কমান্ডারের নাম
১.	উজিরপুর থানা	আঃ ওয়াদুদ সরদার, হাবিবুর রহমান খান, (সাবেক ভিপি, চাখার কলেজ)

২. বাবুগঞ্জ থানা	আবদুল ওহাব খান, আঃ মজিদ খান, আবুল কাসেম, নূর হোসেন (নুরু কমান্ডার) রতন শরিফ, সুলতান মাস্টার
৩. গৌরনদী থানা	নিজাম উদ্দিন আকন হেমায়েত উদ্দিন (গৌরনদী থানার পশ্চিম ও উত্তর এলাকা)
৪. মুলাদী থানা	কুতুব উদ্দিন, আনোয়ার
৫. মেহেন্দীগঞ্জ থানা	কুদ্দুস মোল্লা, মুজিবর রহমান 'শানু', শাহদাত হোসেন, সুলতান শরিফ
৬. বানারীপাড়া থানা	বেনুলাল দাসগুপ্ত, কাজী হাওদার আলী
৭. স্বরূপকাঠী থানা	জাহাঙ্গীর বাহাদুর
৮. নাজিরপুর থানা	জাহাঙ্গীর বাহাদুর, মোকতার আলী, শাহজাহান
৯. ঝালকাঠি থানা	সুলতান মাস্টার, মজিবল হক আঃ খালেক সিকদার
১০. কাউখালী থানা	আঃ হাই পনা, হাবিবুর রহমান, নূরুল ইসলাম
১১ নলছিঠি থানা	সিকান্দার আলী, আঃ ছোবহান
১২ রাজাপুর থানা	এ কে আজাদ, নোকায়ের বিশ্বাস, আবুল কালাম বাবলু (এম.কম ছাত্র–শহীদ)
১৩. ভান্ডারিয়া থানা	আঃ আজিজ, এনায়েত খান
১৪. বাকেরগঞ্জ থানা	নাছির উদ্দিন, আবু জাফর, বজলুর রহমান
১৫. কোতোয়ালি বরিশাল	আঃ মান্নান, মোকছেদ আলী, মোখলেছুর রহমান
১৬. মঠবাড়িয়া	আলতাফ
১৭. পিরোজপুর	আবদুল মান্নান
১৮. কাঁঠালিয়া	সুবেদার এম এ জলিল
১৯. ভোলা-তজুমদ্দিন	সুবেদার কাদির আলী আকবর

২০. বোরহানউদ্দিন	আবদুল আজিজ, সিদ্দিকুর রহমান
২১. চরফ্যাশন	সিদ্দিকুর রহমান
২২. দৌলতখাঁ	মহম্মদ ইব্রাহিম
২৩. লালমোহন	কাজী আলতাফ উদ্দিন

সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টারে যারা ছিলেন :

১. ক্যাঃ শাহজাহান ওমর 'বীর উত্তম' (সাব সেক্টর কমান্ডার)
২. মোঃ আব্দুল হক, সহ-সাব সেক্টর কমান্ডার (বীর বিক্রম)
৩. হাবিবুর রহমান, সহ-সাব সেক্টর কমান্ডার (বীরপ্রতীক)
৪. জামাল উদ্দিন
৫. জিয়াউদ্দিন ওরফে মর্টার জিয়া
৬. আঃ মালেক
৭. আঃ মান্নান
৮. আলী আহমদ (বীরপ্রতীক)
৯. জামাল পাশা
১০. কামাল পাশা
১১. আঃ গফুর মোল্লা (সাবেক ন্যাপ নেতা)
১২. আরব আলী (সাবেক ন্যাপ নেতা)
১৩. শহীদ
১৪. নান্নু
১৫. নূরুল হুদা
১৬. এসএম গোলাম কুদ্দুস
১৭. জহিরুল ইসলাম মিন্টু
১৮. হাফিজ
১৯. আনসার আলী (ডাক্তার)
২০. হাবিবুর রহমান-২
২১. আব্দুল ওহাব
২২. মহিউদ্দিন মানিক (বীরপ্রতীক)
২৩. রফিকুল ইসলাম (বীরপ্রতীক)

২৪. মাসুদ (বরিশাল সদর)
২৫. আব্দুল হক (ড্রাইভার)
২৬. খোকন বিশ্বাস (বীরপ্রতীক)
২৭. আলতাফ হোসেন (বীর বিক্রম) শহীদ
২৮. কাজেম আলী
২৯. মোঃ পারভেজ আহমেদ
৩০. অনিল বড়াল
৩১. শাহজাহান খান
৩২. নূরজাহান (একমাত্র মহিলা)
৩৩. আঃ আউয়াল ইঞ্জিনিয়ার
৩৪. আঃ হক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের লেকচারার, বর্তমানে ডিডি
৩৫. জনাব জাহাঙ্গীর সেরনিয়াবাত।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ বড়াকোঠায় আবুল হাসনাতকে কমান্ডার করে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় একটি বেইস বড়াকোঠোর দায়িত্বে দিয়ে বিভিন্ন থানায় শত্রুদের মোকাবেলার জন্য বেইস কমান্ডারদের কর্মকাণ্ড ও প্রয়োজনে যুদ্ধে সহায়তার জন্য বৃহত্তর বরিশালের সর্বত্র আদেশ-নির্দেশ ও যুদ্ধ করার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা আরম্ভ হয়। নাজিরপুর থানার শ্রীমন্ত কাঠিতে পাক হানাদারদের সাথে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় এবং ৫০ জনেরও বেশি ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হানাদার খতম করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা দুটি পুল এমবুশের মাধ্যমে এই ৫০ জনের অধিক হানাদারকে শেষ করেছিল। এরপর শ্রীমন্তকাঠী থেকে ফেরার পথে কাউখালীর সাগরকান্দা নামক স্থানে গানবোটের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এখানে অসম সাহসিকতার সাথে সহায়তা করেন আঃ হাই পনার বাহিনী। পাকহানাদারেরা পালিয়ে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় বাবুগঞ্জের আগরপুরে আসে। গৌরনদীর আসোকাঠী ব্রিজ ধ্বংস করে। এতে সহায়তা করে গৌরনদীর নিজাম বাহিনী। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ হয়ে বাবুগঞ্জে আসে এবং রতন শরীফ ও মজিদ খানের বাহিনীসহ বাবুগঞ্জ থানা আক্রমণ করে। উক্ত আক্রমণে শত্রু পর্যুদস্ত হলেও এক নির্ভীক গেরিলা মোঃ আলতাফ হোসেন (বীর বিক্রম) শাহদাত বরণ করেন এবং সাব সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমর পিঠে গুলিবিদ্ধ হন এবং

গুরুতরভাবে আহত হন। এর পরে নলছিটির মানপাসা স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে শাহাজাহান ওমরের চিকিৎসা করা হয়। তিনি একটু সুস্থ হবার পর চাচৈর পাশাতে হানাদারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উক্ত স্থানে কালাম নামক এক নির্ভীক যোদ্ধা শহীদ হন, কাজেম আলী (বিডিআর সদস্য) আহত হন এবং অসংখ্য হানাদার ও রাজাকারকে হত্যা করা হয়। এরপর ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নিজের থানায় রাজাপুরে বেইস কমান্ডার আজাদসহ রাজাপুর থানা আক্রমণ করা হয়। প্রতিটি যুদ্ধেই ক্যাপ্টেন সাব সেক্টর কমান্ডার শাজাহান ওমর নেতৃত্ব দেন। রাজাপুরের যুদ্ধে শাহাজাহান ওমর গুলি করতে করতে যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন এই অবস্থায় ওমরের পায়ে ব্রাশ ফায়ার লাগে এবং তিনি ধানক্ষেতে পড়ে যান। উপায় না দেখে সহ-অধিনায়ক আঃ হক বাহিনীকে পজিশনে থাকতে বলে শাহাজাহান ওমরকে তার পিঠে নিয়ে ধানক্ষেত অতিক্রম করে এবং রাজাপুর বাজারে বিহারী ডাক্তার নামে পরিচিত ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাধীন রেখে আঃ হক এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং থানা আক্রমণ করে পুরো থানার রাজাকার আলবদরসহ সকল হানাদারকে বেঁধে জীবন দাসকাঠী স্কুলের মাঠে বিচার করে হত্যা করা হয়। অতঃপর সাব সেক্টর ট্রুপ ভাণ্ডারিয়া থানায় যায় এবং সাব সেক্টর কমান্ডার শাহাজাহান ওমর একটু সুস্থ হলে বাকেরগঞ্জের পাদরিশিবপুর হাসপাতালে সাব সেক্টর কমান্ডারের গুলিবিদ্ধ পা প্লাস্টার করা হয়। এরপর জাফর বাহিনীর সাহায্যে সাব সেক্টর হেডকোয়ার্টার বাহিনীর নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জ থানা আক্রমণ করা হয়। দুইদিন যুদ্ধের পর থানা দখল করে মুক্তিযোদ্ধারা। এই যুদ্ধে বাচ্চু নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অসংখ্য রাজাকার ও হানাদার এই যুদ্ধে খতম হয়। এরপর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সকল থানা মুক্ত করার পর বরিশাল জেলার সদর মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাকেরগঞ্জ থানার পাদরিশিপপুর হতে সকাল ৫টায় বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সাব সেক্টর ট্রুপ। সাব সেক্টর কমান্ডার আহত অবস্থায় সাব সেক্টরের হেডকোয়ার্টারের ৫০ জন বিশিষ্ট গেরিলা যোদ্ধা মর্টার, মেশিনগানসহ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বরিশাল কোতোয়ালি থানার বেইস কমান্ডার আঃ মান্নান বীর প্রতীক ও সহকারী বেইস কমান্ডার মোকসেদ আলী ওরফে মাঝা ভাই, বাবুগঞ্জের বেইস কমান্ডার আঃ মজিদ খান, বেইস কমান্ডার রতন শরিফ বীরপ্রতীক এবং টাউন সুইসাইড স্কোয়াডের কমান্ডার রেজাই সাত্তার ফারুক ও নেভাল কমান্ডার আবুল বাশারকে (নেভাল বাশার) বরিশাল শহরের সার্বিক

পরিস্থিতি জানিয়ে দুপুর ১২টার মধ্যে বুখাইনগর সংলগ্ন স্থানে সংবাদ দেবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। দুপুর ১২-৩০ মিঃ সাব সেক্টর বাহিনী বরিশাল শহরের পূর্ব পাশের কীর্তনখোলা নদীর পূর্ব দিকের কাউয়ারচর সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে এবং নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, মজিদ খান, রতন শরিফ ও রেজাই সাত্তার ফারুক বরিশাল শহরের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহাজাহান ওমরকে অবগত করেন যে তখন বরিশালের পুলিশ লাইনের সম্মুখের রাস্তার উত্তরে বরিশাল শহর মুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। বরিশাল শহরের বেল পার্কসহ ওয়াপদা কলোনি পাক হানাদারের কবলে আছে। ওয়াপদা কলোনিতে যশোর হতে পালিয়ে আসা পাক সেনারা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাবার জন্য স্টিল বডি লঞ্চসহ ভারী জলযান আইডব্লিউটিএর নেভাল জেটিতে একত্র হচ্ছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে ৭ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকার উদ্দেশে এরা রওয়ানা হবে। এই সংবাদ পাবার পর সাব সেক্টর বাহিনী বরিশালের কীর্তনখোলার উত্তরে নদী পার হয়ে নতুন বাজার খালের মধ্যে পৌঁছে বেইজ কমান্ডার আঃ মজিদ খান, রতন শরিফ, নেভাল কমান্ডার আবুল বাশার, সুইসাইড স্কোয়াডের প্রধান রেজাই সাত্তার ফারুককে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের বরিশাল শহরের নিকটবর্তী স্থানসমূহে পজিশনে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

বিকেল ৪টায় সাব সেক্টরের ট্রুপের একটি অংশ এবং সঙ্গে রেজাই ফারুকের টাউন সুইসাইড স্কোয়াডের যোদ্ধারা বরিশাল শহরের সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয়। হানাদার বাহিনীর যশোর হতে আগত প্রায় এক ব্রিগেড সৈন্য যারা ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে তাদেরকে কিভাবে নদী পথে আক্রমণ করা যায় তার ব্যাপারে বেইস কমান্ডারদের সাথে জরুরি মিটিং হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের যে সকল অস্ত্র আছে সেই সকল অস্ত্র দ্বারা এত ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত একটা ব্রিগেডকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরপর ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর একটা জিপে করে বিকাল ৫টার দিকে বরিশাল ওয়ারলেস স্টেশনে যায়।

উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর তদানিন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর (বার্তাবাহক) সিগনাল ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন বলে ওয়ারলেস পারদর্শী ছিলেন। সাব সেক্টর কমান্ডার সারা বাংলাদেশে যোগাযেগা করতে লাগলেন। হঠাৎ খুলনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে খুলনার কাছে ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলকে ওয়ারলেসে পেলেন। বরিশালের ব্যাপারে কথা হলো, ক্যাপ্টেন

শাহজাহান ওমরের সাথে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল জানালেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান দ্বারা কীর্তনখোলা নদী হতে শুরু করে আড়িয়াল খাঁ নদীর নন্দির বাজার পর্যন্ত নদীর মধ্যে হানাদার বাহিনীর নৌবহরে হামলা চলালে ফললাভ হতে পারে। বরিশাল শহরের ওয়ারলেস অফিসের টাওয়ার ও উঁচু দালান কোঠায় বড় বড় সাদা ফ্লাগ উড়ানো হবে যাতে করে কোন বিমান হামলা শহরের ওপর না হয়। সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে বেইস কমান্ডাররা নদীর দুই তীরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান নেয়। শহরের ওয়ারলেসসহ উঁচু দালান কোঠায় রাতের মধ্যেই সাদা বড় আকারের পতাকা উড়িয়ে দেয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। মাইক দিয়ে কারফিউ জারির ঘোষণা করা হলো। সারা রাত কারো চোখে ঘুম নেই, সাজ সাজ রব। সকাল ৬টায় বরিশাল ঘাট থেকে হানাদার বাহিনীর বিশাল নৌযান বহর ঢাকার উদ্দেশে ছাড়লো। মুক্তিযোদ্ধাদের তখন একটাই প্রত্যাশা মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ বিমান কখন আসবে। এদিকে হানাদার বাহিনীর জলযান মাঝ নদীতে সারিবদ্ধ হয়ে চলছে ঢাকার দিকে। সময় ৬টা ১০ মিনিটে (সকাল) হঠাৎ ৩ খানা মিত্র বাহিনীর মিগ বিমান দক্ষিণ দিক থেকে শহর প্রদক্ষিণ করলো। মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত। এর মধ্যে হানাদারদের জলযান কিছুদূর এগিয়ে গেছে। মিত্র বাহিনীর বিমান দু'বার শহর প্রদক্ষিণ করে একটা রকেট আঘাত হানলো লঞ্চ টার্মিনালের ওপর। এরপর সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়ে উত্তর দক্ষিণ হয়ে নদীর মাঝ বরাবর হানাদার নৌযানের ওপর শুরু হলো ৩০ মিনিট ধরে বিমান হামলা। হানাদারদের নৌযানগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো। হানাদার সৈন্য যারা নদী সাঁতরিয়ে কিনারে উঠেছিল তাদেরকে দুই তীরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। এত বড় একটা ব্রিগেডের একটা হানাদারও মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই যুদ্ধে ১২০০ (এক হাজার দুই শত) হানাদারের মৃত্যু ঘটে। এ অপারেশনে একজন মুক্তিযোদ্ধারও কোন ক্ষতি হয়নি।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন বেগ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে শতাধিক ছোট নৌকায় বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বরিশাল পৌঁছে গেছে। পথিমধ্যে লেঃ মইনুলকে সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে ক্যাপ্টেন মেহেদীর স্থলে পটুয়াখালীতে প্রেরণ করা হলো।

বরিশাল শহরের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে অবস্থিত ওয়াপদা কলোনীতে সকল পাকবাহিনী, রাজাকার, আলশামস বাহিনী অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান নিলো (এটি

প্রথম থেকেই বরিশাল পাকবাহিনীর হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল)। ক্যাপ্টেন বেগ তার বাহিনী নিয়ে ঐ হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলে। সাব-সেক্টর বাহিনীও এদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বেগ সঙ্গীয় কয়েকজন চৌকস কমান্ডো যোদ্ধা নিয়ে সুকৌশলে যখন কলোনীর ভেতর প্রবেশ করেছে তখন শত্রু সেনারা ভীত হয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিল এবং ওয়াপদা কলোনীতে অবরুদ্ধ অবস্থানরত শত্রু সেনারা ক্যাপ্টেন বেগ-এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ। সম্পূর্ণ শত্রু সেনা মুক্ত হলো বরিশাল এলাকা।

ফরিদপুর (একাংশ) সাব-সেক্টর যুদ্ধকথা
হেমায়েত বাহিনী

দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতউদ্দিন ফরিদপুর-গোপালগঞ্জের বিশাল এলাকায় 'হেমায়েত বাহিনী' গঠন করে সাহসিকতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কালে তাকে মেজর পদে অধিষ্ঠিত করে ফরিদপুরের একাংশের সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে হেমায়েত বাহিনী ৯নং সেক্টরের আওতায় সাব সেক্টর হিসেবে পরিচালিত হয়।

হেমায়েত বাহিনী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ এলাকার মানুষকে সঙ্গবদ্ধ করে। ফরিদপুরের বিশাল অংশ ৯নং সেক্টরের দুঃসাহসী ছেলেদের সমন্বয়ে হেমায়েত বাহিনী নামটি ১৫ মে বরিশালের গৌরনদী থানার বাড্ডা বাজারের স্কুল মাঠে উৎপত্তি হয় এবং ঐ দিনই স্বাধীনতার পতাকা সেখানে উড্ডীয়মান করাহয়। বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনকে ৯নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে সাব সেক্টর কমান্ডারের মর্যাদা দেয়া হলো। '৭১-এর মে মাসে কোটালীপাড়া থানার জহরেরকান্দি হাইস্কুলে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। স্থাপন করা হয় শরণার্থী ক্যাম্প। অর্থ বিভাগ ছিল হেমায়েত বাহিনী প্রধানের নিজ দায়িত্বে। বেতন-ভাতা দেয়া হতো মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। তবে সবাই নিতেন না। মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধের দায়ে মোট ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ছোটখাটো এবং বড় অপারেশন, এটাক, অ্যাম্বুস ও রেইড ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মোট ১০৪টি অপারেশন হয় এই সাব-সেক্টরে। মোট ৬০ জন রাজাকার ও ৩ দালালের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। গ্রুপ ছিল শেষ পর্যন্ত ৪২টি, হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে বাহিনী প্রধান নিজেই ছিলেন। মহিলা কমান্ডে ছিল মোট ৩৬৫ জন। পুরুষ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিল মোট ৮,৬৪০ জন। গ্রুপ কমান্ডার ৪২ জনের বেশির ভাগ ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর। হাসপাতালে প্রচুর ওষুধ ও খাদ্য ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য মজুদ রাখা হয়। অস্ত্র, গোলাবারুদ কালেকশন করা হতো পাকবাহিনীকে খতম করে।

সাব-সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো :

১. ২৮ মার্চ রাজবাড়ী ক্যাম্প আক্রমণ ও জয়লাভ
২. আরিচা ঘাটের যুদ্ধ
৩. গোয়ালন্দ ঘাটের যুদ্ধ ১ম বার কোটারীপাড়া থানা আক্রমণ ও নাটকীয় কায়দায় জয়লাভ, প্রচুর গোলাবারুদ হাতে আসা।
৪. দ্বিতীয়বার কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ
৫. তৃতীয়বার কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ
৬. ৪র্থ বার কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ
৭. ৫ম বার কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ ও থানা দখল
৮. টেকেহাটের যুদ্ধে জয়লাভ
৯. জলির পাড়ের যুদ্ধ
১০. দিগনগরের যুদ্ধ
১১. বাঘুন্যা ব্রিজের যুদ্ধ
১২. ফরিদপুর পুলিশ লাইনের অস্ত্র দখল
১৩. কামারখালী ঘাটের যুদ্ধ
১৪. কটগাস্তলে রাজাকার পাকড়াও
১৫. মস্তফাপুর রাজাকার বাংকার দখল
১৬. সাউদের ব্রিজে রাজাকার ধরা
১৭. তাঁতী বাড়ি ব্রিজের রাজাকার ধরা
১৮. পাটগাতী রাজাকাদের সাথে যুদ্ধ
১৯. মেয়ারহাট খোলার যুদ্ধ
২০. টিহাটির যুদ্ধ
২১. রাজাপুরের যুদ্ধ
২২. হরিণাহাটির যুদ্ধ
২৩. ফেনাখালীর করফার যুদ্ধ
২৪. থাসবাড়িয়া ঝনজানিয়ার যুদ্ধ
২৫. মাটিভাঙ্গা নদীর যুদ্ধ
২৬. মোল্লার হাটের আক্রমণ
২৭. যর্দিয়ার আক্রমণ
২৮. ফুকরার যুদ্ধ

২৯. ভাটিয়া পাড়ান যুদ্ধ
৩০. চৌধুরীহাট, কাশগুলোর যুদ্ধ
৩১. গোপালপুরের যুদ্ধ
৩২. কুরপালার যুদ্ধ
৩৩. সাতলা বাগধা যুদ্ধ
৩৪. রাজপুরের যুদ্ধ
৩৫. নেয়ার বাড়ি যুদ্ধ
৩৬. মধুমতি নদীর যুদ্ধ
৩৭. রাজবাড়ীর যুদ্ধ
৩৮. ফরিদপুর শহরের যুদ্ধ
৩৯. কালীয়ার যুদ্ধ
৪০. আটঘর কুড়িয়ানায় যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ফরিদপুরের নারাট্যকচর, মমিয়াগার চর, ফরিদপুরের বোয়ালমারি, আলফাডাঙ্গা, পাংশা, কামারখালী, ভাটিয়াপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসেদপুর, রাজৈর, মাদারীপুর, কালকিনি, গোসাইরহাটে যুদ্ধ হয়।

এছাড়া ডামুড্যার যুদ্ধে ১১ জন শহীদ। ভেদরগঞ্জ, শিবচর, গৌরনদী, ভুরঘাটা, কসবা, গরুর হাটের যুদ্ধ (যুদ্ধে শহীদ ১ জন)। উজিরপুর, নাজিরপুর, মোল্লার হাট, কালিয়া, বাগেরহাটের অংশ, ফকিরহাটের অংশ, চিতলমারীর অংশ, কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড যুদ্ধ। রাজাকার ক্যাম্প দখল, রেইড এমবুস, এটাক ইত্যাদি ছিল ফরিদপুর সাব সেক্টরের হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধকথা। শ্রীমঙ্গল কেন্দ্রে মোট ৩৫০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়। ইউনিয়ন ওয়ারী কমিটি গঠন ও সম্পদ রক্ষণসহ কালেকশন, ব্যাংক দখল ও অর্থ সংরক্ষণ, ওষুধ ভাণ্ডারসহ সব কার্যক্রমে হেমায়েত বাহিনী ছিল সুসজ্জিত বাহিনীর ন্যায়। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন বাবুলকে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধাসহ ফরিদপুরের অন্য অংশের সাব-সেক্টর কমান্ডার করে পাঠানো হয়।

পিরোজপুর-বাগেরহাট-সুন্দরবন সাব-সেক্টরের যুদ্ধকথা

বরিশাল পতনের পর লে. জিয়াউদ্দীন সহযোদ্ধাদের নিয়ে সুন্দরবনে চলে যান। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সুন্দরবনে আশ্রয় নেয়। পটুয়াখালীর ছাত্রলীগ নেতা সর্দার রশীদকে হত্যা করার জন্য মেজর নাদের পারভেজ পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তার আত্মীয়স্বজনের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলে। সর্দার রশীদ তার বোন আনু ও মনুকে নিয়ে সুন্দরবনের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মেয়েদের মধ্যে আনু, মনু, ঝালকাঠির মণিকা রায়, কুড়িয়ানার বেলা বিশ্বাস, বিথীকা প্রমুখ আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষা নেয়। ঝালকাঠির মণিকা রায় ও ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা পুলিশের হাতে ধরা পরে। পাকবাহিনী মণিকা ও তার বান্ধবীকে ছেড়ে এবং অন্য ৭ জনকে হত্যা করে। শরণখোলার শামসুদ্দীন, মোড়লগঞ্জের কবির আহম্মদ মধু, আসাদ, মঠবাড়িয়ার শহিদুল হক বাদল, আলতাফ, মুজিবুল হক মজনু, সুবেদার গাফফার, খলিলুর রহমান, নৌবাহিনীর নাসিরউদ্দীন, করপোরাল কবীর, বরকত প্রমুখদের নিয়ে জিয়াউদ্দিন মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে তার ক্যাম্প ছিল। প্রধান ক্যাম্প ছিল সুন্দরবনের বগীতে। জিয়াউদ্দিন মোড়লগঞ্জ ও শরণখোলা থানা আক্রমণ করে অস্ত্র নিয়ে নেয়। সুন্দরবন মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকায় হাজার হাজার শরণার্থী ও ছাত্র যুবকদের ভারতে যেতে সুবিধা হয়। শত শত মুক্তিযোদ্ধা ভারতে ট্রেনিং ও অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের পথে পটুয়াখালী ও বরিশালের বিভিন্ন স্থানে যেতো। মেজর জলিলের আহ্বানে লে. জিয়াউদ্দিন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে আইজুদ্দিন মাঝির সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের পোর্ট ক্যানিং হয়ে প্রথমে ব্যারাকপুরের চার্লি সেক্টরে এবং সেখান থেকে ভারতীয় বাহিনীর চার্লি সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সালেহর সহায়তায় কর্নেল ওসমানির সাথে সাক্ষাত করে ৯নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার হাসনাবাদের 'টাকি'তে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের সাথে সাক্ষাত করে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক সরবরাহকৃত অত্যাধুনিক গানবোট ধ্বংসকারী অস্ত্র ও

গোলা-বারুদসহ মংলা বন্দর অপারেশনের জন্য প্রস্তুত ফ্রগম্যান বাহিনী নিয়ে ৭শ'র মতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত এফএফ নিয়ে নৌকাযোগে সুন্দরবনের ঘাঁটিতে পৌঁছে। সেখান থেকে তৎপরবর্তীতে বেশ ক'টি গানবোট এবং সর্বশেষ ঢাকা-বরিশাল-খুলনা গমনকারী পাকবাহিনী দ্বারা চালিত 'রকেট স্টিমার' আক্রমণ করে বিপুল সাফল্য লাভ করে। দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে গমনেচ্ছুদের ভারতে গমন দুষ্কর ছিল বিধায় কয়েক হাজার যুবক সুন্দরবন এলাকায় জিয়াউদ্দিন পরিচালিত ট্রেনিং ক্যাম্পে অস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে। সাব-সেক্টর কমান্ডার লে. জিয়াউদ্দিনের কমান্ডে সর্বশেষ বেশ কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা সুন্দরবনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থান করে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে পাকবাহিনী ও রাজাকার শূন্য এলাকা প্রতিষ্ঠিত করে। ৯নং সেক্টরের লে. জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন মুক্তিযুদ্ধ ঘাঁটি এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশ স্বাধীনে আরো সময়ের প্রয়োজন হলে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা নির্বিঘ্নে জনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে বহুদিন–জিয়াউদ্দিন সেই চিন্তা মাথায় রেখে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘদিন জনযুদ্ধ চালানোর মতো করে সুদৃঢ় স্থাপনা গড়ে তোলে। এই সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা সুন্দরবনের অভ্যন্তরের ঘাঁটির সাথে লোকালয়ের যোগাযোগের জন্য একটা দীর্ঘ খাল পুনঃখনন এবং রাস্তা নির্মাণ করে। পাকবাহিনীর গানবোটকে ঐ খাল এবং রাস্তা দিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণের অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করে।

লে. জিয়াউদ্দিন পটুয়াখালীর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মেহেদীকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। পরে তাকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয়। দেশ স্বাধীনের পর জিয়াউদ্দিন সেনাবাহিনীতে চাকরিকালে মেজর পদে উন্নীত হন। বর্তমানে এই গেরিলা যোদ্ধা অবসরে থেকে ব্যবসায় রত। পটুয়াখালীর সরদার রশিদের দুই বোন আনোয়ারা বেগম আনু ও মনোয়ারা বেগম মনু এবং ঝালকাঠীর বীথিকা, মনিকা রায়, কুড়িয়ানার বেলা বিশ্বাস এই সাব-সেক্টরে গঠিত নারী মুক্তিযোদ্ধা দলের সদস্য হিসেবে বেশ কিছু সম্মুখযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে। তারা ৯নং সেক্টরের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নারী মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনী সুন্দরবন দখলের জন্য নৌ ও বিমান হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে কয়েকটি গানবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাকসেনারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী কোনোদিন সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি।

লে. জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা, রায়েন্দা ও মঠবাড়িয়া

থানা আক্রমণ করা হয়। তার নির্দেশে সহঅধিনায়ক শামসুল আলম, লে. আলতাফ, মজিবল হক মজনু, শহিদুল আলম ১৫ অক্টোবর তুষখালী আক্রমণ করে খাদ্য গুদাম হতে ২২০০ মণ খাদ্য নিয়ে যায়। লে. জিয়াউদ্দিন ১০ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর রায়েন্দা ক্যাম্প আক্রমণ করে এবং সেখানে তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে মোড়েলগঞ্জের আসাদ, পাথরঘাটার আলাউদ্দিন এবং বরিশাল শহরের কলেজ রোডের টিপু শহীদ হয়। টিপু বিএম স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। সাব-সেক্টর কমান্ডার লে. জিয়াউদ্দিনের বাহিনী ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া ও পিরোজপুর থানা দখল করে ৭ ডিসেম্বর পিরোজপুর মুক্ত করে। জিয়াউদ্দিন পিরেজপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তাজুল ইসলাম তার বাহিনী নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাগেরহাট শহর দখল করেন এবং লে. জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মেজর জলিলের নির্দেশে খুলনার দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনার উপকণ্ঠে অবস্থান নেয়।

পটুয়াখালী সাব-সেক্টরের যুদ্ধকথা

পটুয়াখালী ও বরগুনা মহকুমা নিয়ে পটুয়াখালী সাব-সেক্টর গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন মেহেদী পটুয়াখালীর কমান্ডার এবং জহির শাহ আলমগীর টোআইসি বা সহঅধিনায়ক ছিল। কয়েকটি উপদলকে একত্রিত করে মেহেদী অস্ত্র সংগ্রহ করে। বেতাগীর হিরু আনসারদের নিকট থেকে কয়েকটি রাইফেল উদ্ধার করে মেহেদীকে দেয়। মির্জাগঞ্জের হারুন-অর-রশিদ কয়েকটি অস্ত্র নিয়ে মেহেদীর সাথে যোগ দেয়। বরগুনার ছাত্রলীগ নেতা সিদ্দিক, দীলিপ, রশীদ হোগলপাতির কামাল, জামাল প্রমুখ ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে চলে আসেন এবং তারা সামরিক ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে চলে আসে। মেহেদী অস্ত্র আনার জন্য ৩০ আগস্ট জহির শাহ, আলমগীর ও আউয়ালকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। সে নিজে সুন্দরবন গিয়ে লে. জিয়াউদ্দিনের ক্যাম্প হতে অস্ত্র নিয়ে আসে। বামনা থানার বুকাবুনিয়া স্কুলে পটুয়াখালী সাব-সেক্টরের প্রধান ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাপ্টেন মেহেদী ৫ জন কমান্ডার নিয়োগ করে– সুবেদার হাতেম– আমতলী-খেপুপাড়া, সুবেদার আবদুল মজিদ– বামনা, পুলিশ কাসেম– পাথরঘাটা, আবদুস ছাত্তার– বরগুনা, হারুন-অর-রশীদ ও আলতাফ হায়দার– মৃজাগঞ্জ, মোতালিব– বেতাগী। জুন মাস হতে মুক্তি বাহিনী রাজাকার ও দালাল হত্যার অপারেশন চালায়। বেতাগী থানার কয়েকজন কুখ্যাত দালাল মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়। পটুয়াখালীর দক্ষিণ মুক্ত ছিল। পাকবাহিনী উপকূলে যায়নি। বামনার সুবেদার হাতেম খেপুপাড়া ও আমতলীর কমান্ডার ছিল। তালতলীর আগাঠাকুর পাড়ায় তার ক্যাম্প ছিল। দালালদের সহযোগিতায় পাকসেনারা নভেম্বর মাসে হঠাৎ আগাঠাকুর পাড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আক্রমণ করলে সুবেদার হাতেম তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। উভয়পক্ষে হতাহত হয়। পাকবাহিনী ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আহত অবস্থায় বন্দী করে পটুয়াখালী নিয়ে আসে এবং ১৯ নভেম্বর তাদের ডিসির লঞ্চ ঘাটে হত্যা করে। আলতাফ হায়দার ও হারুন-অর-রশীদ হিরুর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী

মৃজাগঞ্জ থানা আক্রমণ করে অস্ত্র নিয়ে নেয় এবং কয়েকজন রাজাকার হত্যা করে।

সাব-সেক্টরের কমান্ডারগণ

পটুয়াখালী	—	গাজী দেলওয়ার হোসেন, নূরুল হুদা।
মির্জাগঞ্জ	—	আলতাফ হায়দার।
বাউফল	—	পঞ্চম আলী।
গলাচিপা	—	আবদুর রব, নূরুল হুদা
খেপুপাড়া আমতলী	—	সুবেদার হাতেম আলী।
বরগুনা	—	আবদুস ছাত্তার, জুলফিকার ফুলফু।
বেতাগী	—	আবদুল মতলেব।
বামনা	—	আবদুল মজিদ।
পাথরঘাটা	—	আবুল কাসেম।

নবম সেক্টর কমান্ডারের আহ্বানে ক্যাপ্টেন মেহেদী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুজিবনগর গমন করে এবং নবম সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডারদের অধিবেশনে যোগ দেয়। তার অবর্তমানে জহির শাহ আলমগীর মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যায়। পটুয়াখালী জেলায় মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা খেপুপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, বামনা, পাথরঘাটা, মির্জাগঞ্জ আক্রমণ করে অস্ত্র উদ্ধার করে। তাদের হাতে অনেক রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্য নিহত হয়। ছাত্রনেতা গাজী দেলওয়ার তার বাহিনী নিয়ে অনেক রাজাকার ও দালাল খতম করে। পটুয়াখালী শহরের নিকট সে কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে পাক বাহিনীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। মৌকরণের কাজী মোতালেব পটুয়াখালীর সাবেক এমপিএ রাজা মিয়ার হত্যাকারী সুবেদারকে মৌকরণের বাজার থেকে ধরে হত্যা করে।

২৩ নভেম্বর সুবেদার জামালের নেতৃত্বে পাক সেনারা বেতাগী যায়। তারা বদনীখালী বন্দর লুট করে এবং আগুন দিয়ে বাজার পুড়ে ফেলে। লুটের পর লঞ্চে করে পাকবাহিনী বরগুনা ফিরছিল। বেতাগী মৃজাগঞ্জ হতে আলতাফ হায়দার ও মোতারেব তাদের দল নিয়ে পাকবাহিনীর লঞ্চ আক্রমণ করে। পাকবাহিনীর লঞ্চ হতে পাল্টা আক্রমণ চালায়। নদীর পশ্চিম তীর হতে

বুকাবুনিয়া ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজির ফায়ার করে। পাক সুবেদার জামাল অতি দ্রুত লঞ্চ থেকে তীরে উঠে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। এলএমজির সামনে মুক্তিবাহিনী টিকতে পারেনি। তারা পিছু হটে যায়। এক বাক্স কার্তুজসহ মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝি ধরা পড়ে। পাকবাহিনী আহত হয় এবং তারা বরগুনা পৌঁছে দেখলো সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই রাতের অন্ধকারে পাকসেনারা সদলবলে বরগুনা ত্যাগ করে। ২৪ তারিখ ভোরে বুকাবুনিয়ার মুক্তিবাহিনী বামনা থানা আক্রমণ করে। সারাদিন সংর্ঘষ চলে। জহির শাহ আলমগীর, জুলফু, মজিদ ও মোবারক মল্লিক, ছত্তার প্রমুখ বামনা থানা আক্রমণে অংশ নেয়। হাজার হাজার জনতা জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দেয়। বিকেলে দেশীয় পুলিশ ও রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করে। বামনা থানায় ২৪ জন রাজাকার নিহত হয়। ২৪ তারিখে জহির শাহ, মোতালেব, জুলফু প্রমুখ বেতাগী থানা আক্রমণ করে দখল করে। ২৫ নভেম্বর জহির শাহ, কমান্ডার কাসেম, জুলফু প্রমুখ পাথরঘাটা থানা আক্রমণ করে এবং কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর থানার পুলিশ ও রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। সংঘর্ষের সময় একদল শান্তিকমিটি নৌকায় যখন পালাচ্ছিল তখন মুক্তিবাহিনী তাদের ধরে গুলি করে হত্যা করে। ২৭ নভেম্বর সকালে বেতাগীর আবদুস ছত্তার (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), বরগুনা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি নূরুল ইসলাম সিকদার, মুহম্মদ জহির প্রমুখ মুক্তিবাহিনী নিয়ে বরগুনা মহকুমা শহর দখল করে। ২৭ নভেম্বর বরগুনা মহকুমা স্বাধীন হয়। বরগুনা থানা পতনের পূর্বে সিআই পুলিশ আনোয়ার হোসেন অনুগত পুলিশ নিয়ে আমতলী থানায় আশ্রয় নেয়। ১২ ডিসেম্বর রাতে গলাচিপার আবদুর রব তার বাহিনী নিয়ে একে স্কুল হতে আমতলী থানা আক্রমণ করে। তার সাথে ছিল আমতলীর আফাজ বিশ্বাস, পাশা, মইন, নিজাম, কুতুব প্রমুখ। পরিশেষে সারারাত সংঘর্ষের পর আমতলী থানা আওয়ামী লীগ সসভাপতি আসমত আলী আকনের মাধ্যমে থানার পুলিশ ও রাজাকার আত্মসর্পণ করে। সিআই পুলিশ আনোয়ার ও দারোগা রইস ভুঁইয়াকে হত্যা করা হয়।

২৭ নভেম্বর পানপট্টির যুদ্ধের পর কমান্ডার নূরুল হুদা, হিরু ও আবদুর রব বাউফল ও গলাচিপা থানা দখল করে। এদিকে গাজী দেলওয়ার বেটি নামে একটি বিদেশী জাহাজ দখল করে। নৌবাহিনীর শাহজাহান বেটিকে যুদ্ধ জাহাজ হিসেবে ব্যবহার করে। সুবেদার হাতেম, গাজী দেলওয়ার, মোয়াজ্জেম খেপুপাড়া থানা আক্রমণ করে এবং সারারাত যুদ্ধের পর থানার দারোগা আত্মসমর্পণ করে।

সুবেদার হাতেম ১৩ ডিসেম্বর কুয়াটাকার নিকট পাক সেনাদের জাহাজ এম এল বারকি আক্রমণ করে ৩৭ জন পাক সেনা বন্দী করে এবং অনেক অস্ত্র উদ্ধার করে। যশোর পতনের পর একদল পাক সেনা একজন লেফটেন্যান্টের নেতৃত্বে পালিয়ে কুয়াকাটা পৌঁছে। সকল পাকসেনাকে ২০ ডিসেম্বর পটুয়াখালী জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। আলতাফ হায়দার ও হরুন-অর-রশীদ ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে মির্জাগঞ্জ থানা দখল করেন। যশোর ক্যান্টনমেন্ট পতনের পর পাক সেনারা পালাতে থাকে। মেজর ইয়ামিন ৬ ডিসেম্বর পটুয়াখালী শহর ত্যাগ করে বরিশাল চলে যায়। ৭ ডিসেম্বর নূরুল হুদার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পটুয়াখালী শহর দখল করে। এই সাব-সেক্টরে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন মেহেদীর স্থলে লে. মাইনুল (মেজর মইন) সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

খুলনা অঞ্চলের যুদ্ধকথা

৯নং সেক্টর এলাকাভুক্ত সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের মুক্তি পিপাসু যুবসমাজের ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্রসহ দেশের ভেতর ঢুকে যুদ্ধ ছালানোর জন্য Exit ও Entrence এরিয়া ছিল খুলনা অঞ্চলের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা। এই সীমান্ত পথের খানজিয়া, দেবহাটা, টাউন শ্রীপুর, বসন্ত পুর, উকসা, কৈখালীসহ সংলগ্ন বিওপিগুলো এপ্রিলেই পাকবাহিনী দখল করে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের যুবকদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ এবং ট্রেনিং নিয়ে এসব বর্ডার এলাকা পার হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ বিপদসংকুল হয়ে পড়ে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, সেক্টর সহঅধিনায়ক ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা (হিরু)সহ অন্য কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠকে ঐসব বিওপি বরাবর হামলা চালিয়ে এগুলো দখল করে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে খুলনা এলাকায় সব ধরনের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন হুদার কমান্ডে ক্যাপ্টেন বেগ-এর সহায়তায় বসন্ত পুর বিওপি'র বরাবর ভারত সীমান্তে হিঙ্গলগঞ্জে সেক্টর অপারেশন ট্রুপস ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

মূলত খুলনা অঞ্চলের সর্বোতভাবে অপারেশনের জন্য সেক্টর সহঅধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদাকে সেক্টর ট্রুপস-এর কমান্ডার, পরে তার অধীন ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগকে দিয়ে সেক্টর ট্রুপস খুলনা অঞ্চলে অপারেশন আরম্ভ করে। এ অঞ্চলের দেবহাটা-টাউন শ্রীপুর অঞ্চলে ক্যাপ্টেন হুদার অধীনে মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেন সাজাহান মাস্টার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। হরিনগর-কইখালী সীমান্ত এলাকায় লে. সলিমুল্লাহকে দায়িত্ব দিয়ে অপারেশন ক্যাম্প গঠন করে ঐ এলাকার পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এদিকে খুলনার অশাশুনি-তেরোখাদা অঞ্চলে লে. আরেফিরেন দায়িত্বে যুদ্ধ চলে। খুলনা অঞ্চলের যুদ্ধে সুন্দরবন এলাকার সাব-সেক্টর কমান্ডার লে. জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার যুদ্ধে সেক্টর অপারেশন ট্রুপস-এর যুদ্ধ পরিচালনায়

সহায়তা করে।

খুলনা এলাকার উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলো মংলা পোর্টের যুদ্ধ, খানজিয়া বিওপি'র যুদ্ধ, টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধ, দেবহাটা থানা দখল যুদ্ধ, কালিগঞ্জের যুদ্ধ, বসন্তপুরের যুদ্ধ, উকসা বিওপি'র যুদ্ধ, শ্যামনগর থানা দখলের যুদ্ধ, পারুলিয়া ব্রিজের যুদ্ধ, কুলিয়া ব্রিজের যুদ্ধ, হরিণগঞ্জ ও কইখালীর গানবোটের সাথে যুদ্ধ, গাবুরার যুদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়া খুলনা অঞ্চলে সেক্টর অপারেশন ট্রুপসের অংশগ্রহণে ক্যাপ্টেন হুদার কমান্ডে এবং ক্যাপ্টেন বেগ-এর নেতৃত্বে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালে আরো অনেকগুলো খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থের অন্যস্থানে খুলনার যুদ্ধ, সাতক্ষীরার যুদ্ধ, মংলার যুদ্ধ, গাবুরার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধকথার বিবরণ দেয়া হলো।

খানজিয়া বিওপি'র যুদ্ধ

খানজিয়া বিওপি'র অবস্থান আন্তর্জাতিক সীমারেখায় ইছামতি নদীর পূর্বপার্শ্বে। ইছামতি নদী ৩০০ মিটার প্রশস্ত এবং এর পশ্চিম তীর ভারত। তদুপরি মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টর সদর দপ্তর টাকি ইছামতি নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ও নদীর কারণে পাকবাহিনী খুব সহজেই খানজিয়া বিওপি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পারতো। তাই এই বিওপি দখল করা মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

খানজিয়া বিওপি নদী পার্শ্বস্থ বাঁধের উপর স্থাপিত বিধায় অন্যান্য সমতল এলাকা থেকে ১০/১২ ফুট উপরে অবস্থিত। যার কারণে উক্ত এলাকা থেকে সহজেই শত্রুকে পর্যবেক্ষণ ও ফায়ার আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষতিসাধন করা সম্ভব। তাই রণকৌশলগত দিক থেকে এই বিওপি'র গুরুত্ব অপরিসীম।

পাকবাহিনী খানজিয়া বিওপিতে চতুর্মুখী প্রতিরক্ষা (All Round Defence) অবস্থান নেয়। বিওপিতে পাকসেনাদের শক্তি ছিল দুই প্লাটুন। বিওপিতে ৪টি এলএমজি পোস্ট পারস্পরিক সহায়তা (Mutual Support) এবং প্রধান দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ফায়ার প্রদান করে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিওপি'র চারদিকে ৩/৪ ফুট উঁচু এবং ২/৩ ফুট পুরু মাটির ঢিবি বসিয়ে পাকবাহিনী ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়।

১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে মুক্তিবাহিনী ১০ জনের গ্রুপ ২/৩ বার বরুনা হাট দিয়ে খানজিয়া বিওপিতে বিক্ষিপ্তভাবে হামলা চালায়। কিন্তু

পাকসেনদের প্রবল প্রতিরক্ষা অবস্থান সরাতে ব্যর্থ হয়। মেজর জলিল পাক ঘাঁটি খানজিয়া দখলের জন্য ক্যাপ্টেন নূরুল হুদাকে কমান্ডার বানিয়ে আরো অধিক জনবল নিয়ে খানজিয়া হানা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আক্রমণের ২/৩ দিন পূর্বে কমান্ডোদের একটি দল সন্ধ্যার দিকে ইছামতি নদী পার হয়ে খানজিয়া বিওপি'র বিস্তারিত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে। ক্যাপ্টেন হুদা খানজিয়া বিওপি আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা নেয়।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেজর জলিলের নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা মুক্তিবাহিনীর ১৬০ জন সদস্য নিয়ে পাক ঘাঁটি খানজিয়া বিওপি আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী টাকি হতে সন্ধ্যার পর ইছামতি নদী পার হয়ে দেবহাটা-দাদপুর দিয়ে রাত ১০টার দিকে খানজিয়া প্রাইমারি স্কুল এলাকায় সমবেত হয়।

সমগ্র দলটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যার দু'টি অ্যাকশন পার্টি থাকে এবং একটি কাট অফ পার্টি। ডান দিকের অ্যাকশন পার্টির কমান্ডার হিসেবে ক্যাপ্টেন হুদা নিজে রইলেন। বাম দিকের অপর অ্যাকশন পার্টির দায়িত্বে ক্যাপ্টেন বেগ থাকেন। হাবিলদার সোবহান রইলেন কাট অফ পার্টির কমান্ডার হিসেবে। কাট অফ পার্টি খানজিয়া মসজিদে অবস্থান নেয় এবং নায়েব সুবেদার গফুর ৩ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে খানজিয়া বাজারে অবস্থান নেয়।

প্রথমে নায়েব সুবেদার গফুর পাকবাহিনীর অবস্তান লক্ষ্য করে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ৫ মিনিট গোলা বর্ষণ করে। এরপর ক্যাপ্টেন হুদা ও লে. বেগ দুদিন থেকে পাক সেনাদের আক্রমণ করে। ৩০ মিনিট ধরে এই সংঘর্ষ স্থায়ী হয়। প্রবল গোলাগুলির মুখে পাক সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পালিয়ে সাতক্ষীরা ও পারুলিয়ায় অবস্থান নেয়।

৩০ মিনিটের এই ব্যাপক সংঘর্ষে পাকবাহিনীর হতাহতের সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে তাদের কাছ থেকে ২টি ২ ইঞ্চি মর্টার, কয়েকটি চায়নিজ এসএমজি ও রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাগুলি ও রেশন সামগ্রী মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করে। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আহত অবস্থায় জনগণের সহায়তায় ৪ জন পাক সেনা ধরা পড়ে।

বসন্তপুর যুদ্ধ ও টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধ

পাক সেনাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল শংকরা, শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী,

বসন্তপুর, উকসা এবং কৈখালী। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা বসন্তপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। একই সময়ে টাকি বেইস থেকে শ্রীপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণেরও সিদ্ধান্ত হলো। হাবিলদার সোবহান ইছামতী পেরিয়ে 'রেকি' করে সকল তথ্য সংগ্রহ করলো।

১২/১৩ জুন রাতে ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুন নিয়ে বসন্তপুর পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলো। অপর দিকে ইছামতী পেরিয়ে মুক্তিবাহিনীর লে. মুখার্জী হাবিলদার সোবহান এবং মোজাহিদ ক্যাপ্টেন শাজাহান মাস্টারের নেতৃত্বে একটি করে প্লাটুন শ্রীপুর পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলো। মুক্তিবাহিনীর এই দুটো দলই রাত ১২টার পর পাক ঘাঁটি আক্রমণ করে বসলো। পাকিস্তানিরা এই আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা ভাবতেও পারেনি এই দুর্যোগময় রাতে প্রমত্তা ইছামতী পেরিয়ে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা এবং ক্যাপ্টেন বেগ-এর তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা চরমভাবে মার খেলো। সংঘর্ষে ২০ জন পাক সেনা নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হলো। মুক্তিবাহিনী ৫০টি রাইফেল, দু'টি এলএমজি এবং বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করে।

অপরদিকে ক্যাপ্টেন শাজাহান মাস্টারের নেতৃত্বে শ্রীপুরেও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ সফল হয়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও মুক্তিবাহিনী ৩৫টি রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করে। দু'টি অপারেশনেই মুক্তিবাহিনী সদস্যদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ভোরবেলা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

উকসা বিওপি যুদ্ধ

ক্যাপ্টেন হুদা হিঙ্গলগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই উকসা বিওপি দখল করে তার ঘাঁটি তথায় স্থাপন করলেন। আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীর অবস্থান উকসা আক্রমণ করে। ৩০ আগস্ট উকসা-গোবিন্দপুরে মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির উপর প্রায় ৪০০ পাকসেনা আক্রমণ চালালে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এখানে যুদ্ধে ৮ জন পাকিস্তানি নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত

হয়। পরে জানা গেছে, পাক মেজর গুরুতর আহত হলে সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

শ্যামনগর থানা দখলের যুদ্ধ

২০ আগস্ট তারিখে শ্যামনগরের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকসেনাদের এক বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদার নেতৃত্বে ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা শ্যামনগর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। ক্যাপ্টেন হুদার সঙ্গে লে. বেগ, সুবেদার ইলিয়াস, নায়েব সুবেদার গফুর, হাবিলদার সোবহান, হাবিলদার আবদুল হক প্রমুখ যোদ্ধারাও ছিলেন। মুক্তিবাহিনীর দলটি উকসা থেকে রওনা হয়ে রাত ২টায় শ্যামনগর শত্রুব্যুহের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শ্যামনগর ওয়াপদা কলোনিতে অবস্থানরত পাকসেনাদের এক প্লাটুন শক্তি ছিল। পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। ক্যাপ্টেন হুদা তার বাহিনীকে তিনটি কলামে বিভক্ত করলেন এবং একটি কলামে তিনি নিজে রইলেন।

সড়কের অপর পাশে একটি কলামের সঙ্গে রইলেন লে. বেগ। নায়েক সুবেদার আবদুল গফুর হাবিলদার সোবহান রইলেন অপর কলামে। মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র ছিলো ৮টি এলএমজি, এসএমজি ১২টি, ২ ইঞ্চি মর্টার ৩টি এবং অবশিষ্ট এসএলআর ও রাইফেল। মুক্তিবাহিনী যথাযথ অবস্থানে পৌঁছে গেলে রাত ২টার পর পরই নায়েক সুবেদার গফুর ২ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে প্রথম পাক অবস্থানে আঘাত হানতে শুরু করলেন। এদিকে পাকসেনাদের প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করে ক্যাপ্টেন হুদা এবং লে. বেগ কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। রাত ৪টার দিকে কালিগঞ্জ থেকে পাকসেনাদের আর একটি প্লাটুন নির্বিবাদে শ্যামনগর চলে আসে। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে। উভয়পক্ষের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। গুলিবৃষ্টির মধ্যে সুবেদার ইলিয়াস ক্রলিং করে ওয়াপদা কলোনীর ভেতর প্রবেশ করে পজিশন নিলেন। সুবেদার ইলিয়াসকে লক্ষ্য করে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ক্রলিং করে কলোনীর ভেতর প্রবেশ করে। ইত্যবসরে ক্যাপ্টেন হুদা বেশ অগ্রসর হয়ে যান। মুক্তিবাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা চরমভাবে মার খেয়ে পালিয়ে যায়। সকাল ৯টায় শ্যামনগর মুক্তিবাহনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সেখানে ৪ জন পাকসেনার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ৪ জন পাকিস্তানী আহত অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী শ্যামনগর থানা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেও বিজয়ের চরম দণ্ড দিতে হয়।

সুবেদার ইলিয়াসসহ ৮ জন এখানে শহীদ হন এবং ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। ঐদিন সকালে ২৫ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। ক্যাপ্টেন হুদা শ্যামনগর থানায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন।

কালিগঞ্জ যুদ্ধ

নভেম্বরের ২০ তারিখে কালিগঞ্জে পাকিস্তানিদের সঙ্গে এক সংঘর্ষ হয়। কালিগঞ্জের ওয়াপদা কলোনীতে পাকসেনাদের একটি কোম্পানি অবস্থান করছিলো। এছাড়া ছিলো পশ্চিমা রেঞ্জার এবং বেশ কিছু রাজাকার। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা তার বাহিনী নিয়ে উক্সা বিওপি ক্যাম্প থেকে রওয়ানা হয়ে টার্গেটের নিকট এসে পৌঁছলেন। এ সময়ে একটি কলাম নিয়ে লে. আহসানউল্লাহ এবং নায়েব সুবেদার সোবহান শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি এসে পড়লো। সঙ্গে ছিলো মাত্র দু'টি প্লাটুন। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা নিজে একটি কলাম নিয়ে বসন্তপুর হয়ে কালিগঞ্জ পৌঁছলেন। নায়েক সুবেদার গফুরও একটি প্লাটুন নিয়ে অপরদিকে অবস্থান নিলেন। ভোর ৫টায় মুক্তিবাহিনী প্রথম পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালালো। মিত্রবাহিনীর তৃতীয় রাজপুত হিঙ্গলগঞ্জ থেকে মুক্তিবাহিনীকে আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। এই দু'ঘণ্টা স্থায়ী সংঘর্ষে কোনো পক্ষেরই কোনো হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। লে. আহসানউল্লাহ নিজেই ২২ জন পাকসেনাকে বন্দী করে। নায়েক সুবেদার গফুরও ৬ জন খানসেনাকে বন্দী করেন। কালিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হলো। পাকিস্তানিরা পালিয়ে আলীপুর নামক স্থানে অবস্থান নেয়। তারা আলীপুরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে।

হরিনগরে গানবোটের সাথে যুদ্ধ

দক্ষিণ অঞ্চলের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র পরিবহনের সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ রাস্তা ছিল কৈখালী-হরিনগর সংলগ্ন নদীপথ। এ পথ দিয়ে দেশত্যাগী মানুষরা আশ্রয়ের জন্য ভারতে যেতো। ফলে পাকবাহিনীর গানবোট প্রায়ই টহল দিতো এ নদী পথে। পাকসেনারা প্রায়ই গানবোট থেকে এলাকাতে সেলিং করতো এবং তীরে নেমে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার করতো।

ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে সুবেদার বাসার ও লে. সলিমুল্লাহ এই গানবোট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন শ্রাবণ মাস। প্রায়ই বৃষ্টি নামে। সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল গুড়িগুড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করে গানবোট আক্রমণের জন্য। অথচ তাদের কাছে গানবোটের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেই। আছে দেশমাতৃকার জন্য জীবনদান করার অদম্য সাহস। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গানবোট আক্রমণ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের। তারপরেও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

ঘটনার দিন মুক্তিযোদ্ধাদের দূরবীনে ধরা পড়ে পাকবাহিনীর দুটি গানবোট। এর মধ্যে একটি আবার অতি শক্তিশালী। কাছাকাছি গেলো ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতেই মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজি দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে গানবোট দুটি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে অংশ নেয় মিজানুর, আবুল হোসেন, সামসুর রহমান, নূর মোহাম্মদ, মকবুল, অজয়, অবনী, কেয়াতলার মজিদ প্রমুখ।

মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিববাহিনীর মাঝে মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব

মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ছোটখাটো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর (BLF) যদিও লক্ষ্য ছিল বাংলার স্বাধীনতা কিন্তু এ দুই বাহিনীর হাই কমান্ড ভিন্ন থাকায় এবং যুদ্ধের কৌশলগত পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই দুই বাহিনীর মধ্যে মাঝে মধ্যে রণক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তবে এ দ্বন্দ্ব কোন ব্যাপক রূপ না নিলেও যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সময় সময় সমস্যার সৃষ্টি হতো। মুক্তিযোদ্ধারা শুধু পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ ও গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে ওদের খতম করাসহ ওদের গোলাবারুদ ও স্থাপনা ধ্বংস এবং অধিগ্রহণ করে নিত। কিন্তু মুজিববাহিনীর মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সৃষ্ট মুক্তাঙ্গনে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ও দৃষ্টিকোণ দিয়ে ঐসব এলাকায় বিজয়ের পরবর্তী বেসামরিক প্রশাসনসহ স্থানীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শগত অবস্থান দৃঢ় করা। এসব করতে গিয়ে প্রায়ই এই দুই বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো। তবে পরবর্তীতেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সেগুলো ধৈর্যের সাথে আপোস রফায় নিয়ে আনতেন। ৯নং সেক্টর এলাকার মুজিববাহিনীর সেক্টর কমান্ডার তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক এবং আমির হোসেন আমু এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। খুলনা অঞ্চলের মুজিববাহিনীর কমান্ডার কামরুজ্জামান টুকুও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধারা দলমত নির্বিশেষে যুদ্ধ করেছে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে, কিন্তু বেসামরিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা অতটা নজর দেবার মনমানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেনি। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক আদর্শগত প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেভাবেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করত মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুমুক্তকৃত মুক্তাঞ্চলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্ত এলাকা থেকে এগিয়ে পাকবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনে মুজিব বাহিনীও কিছু যুদ্ধ করেছে। যা হোক এটা ছিল তখন

থেকেই শুরু হওয়া একটা দ্বন্দ্ব। এই বাহিনীর মধ্যে থেকেই স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হয় যা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত এই বাহিনী কার্যকর ছিল। ঐ সময় ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পরেই রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হয়ে এদের অনেককেই সেনাবাহিনীতে নেয়া হয়।

ছাত্রলীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাসহ বিপ্লবী নেতাকর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ

৯নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় ছাত্রলীগসহ অন্যান্য তৎকালীন রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থানে থেকে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। বরিশাল ছাত্রলীগের খান আলতাফ হোসেন অরুন, আ স ম ফিরোজ, এনায়েত, মনসুরুল আলম মন্টু, মুসফিকুর রহমান, খান আলতাফ হোসেন ভুলু, শাহনেওয়াজ, রেজায়েছত্তার ফারুক, ফরিদুল আলম মাছুদ। খুলনার কামরুজ্জামান টুকু, কাইউম, স.ম. বাবর আলী। পটুয়াখালীর সরদার রশিদ, আনোয়ার, বিডি হাবিবসহ বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের অকুতোভয় বিপ্লবী গেরিলা নেতা প্রয়াত আব্দুস ছালাম ওরফে সিরাজ সিকদারসহ শত শত ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধারা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ৯নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী এলাকায় ৯ মাস গেরিলা পদ্ধতিসহ সম্মুখ সমরে পাক দখলদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন এতে অনেক মুক্তিযোদ্ধার দেশমাতৃকার জন্য রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছেন, কেউ কেউ শরীরে পঙ্গুত্বের বোঝা নিয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। তাদের বীরগাথা লেখার মতন কোন পাতা ও আজ ইতিহাসে নেই। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের তত্ত্বাবধানে ৯নং সেক্টর থেকে হাজার হাজার গেরিলাদের ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে, ট্রেনিংঅন্তে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দলে দলে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ৯নং সেক্টর এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ চালানোর কাহিনী স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও যখন দেখি এক অজানা ইতিহাস হিসাবে অনুপস্থিত, তখনই নিজের মধ্যে তাগিদবোধ করি, অনুভব করি এ ৯নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী লেখার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও সবাইকে অবগত করতে অথবা স্মৃতিতে থাকা অনেকের কাছে অজানা কাহিনী ছাপার অক্ষরে রক্ষা করতে।

৯নং সেক্টরের মুখপত্র 'বিপ্লবী বাংলাদেশ'

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধকাহিনীসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের খবরসমূহ ৯নং সেক্টর অন্তরর্ভুক্ত সকল অবস্থানে প্রচারের জন্য 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ৪ আগস্ট '৭১-এ মুজিবনগর সরকারের নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন (নম্বর ১৯) নিয়ে সম্পাদক নূরুল আলম ফরিদ এর উদ্যোগে ও ৯নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বশিরহাটের হাসনাবাদ থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিতে সম্পাদক নূরুল আলম ফরিদের সাথে মিন্টু বসু, ইউসুফ হোসেন কালু এবং ফটোগ্রাফার তৌফিক ইসলাম লীপু ও মানসসহ একঝাঁক তরুণ সাংবাদিক জড়িত ছিল। পত্রিকাটি মুজিবনগর হেড কোয়ার্টার, ৯নং সেক্টরের মুক্ত এলাকাসহ সেক্টরভুক্ত সকল ক্যাম্প ও স্থাপনায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাগণসহ মুক্তিকামী মানুষগুলোর জন্য একটা প্রেরণার উৎস ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত সকল এমএনএ ও এমসিএসহ সকল স্তরের জনগণ এ পত্রিকার পাঠক ছিলেন। শত আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও ফরিদসহ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকগণ বহু শ্রম ব্যয়ে মুক্তিযুদ্ধের কলমসৈনিক হিসেবে ৯নং সেক্টরের মুখপত্র 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতাপরবর্তীতে এই 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' বরিশাল থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ প্রথমে সাপ্তাহিক এবং পরে দৈনিক হিসেবে ১৯৯৬তে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক নূরুল আলম ফরিদের সাথে মিন্টু বসু ও অন্যান্যগণ মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টরের মুক্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ এবং আমার সহায়তায় বিদেশী সাংবাদিকদের মুক্ত এলাকায় নিয়ে যেত। লিটু ও মানস এর ক্যামেরায় এসবের চিত্র তুলে পত্রিকাটিতে প্রকাশ করতো। প্রায়ই এর কাগজের দাম, ছাপা খরচসহ আনুষাঙ্গিক খরচ জোগার হতো না। এগুলো মেজর জলিল, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে আমাদের মাধ্যমে ব্যবস্থা হয়ে যেতো। 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' তখন আমার মতে একটা সাব-সেক্টরের ভূমিকা পালন করে।

ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং ৯নং সেক্টর এলাকা মুক্তকরণ

'৭১-এর নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই বিভিন্ন সূত্রে আমরা অবগত হই যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ডিসেম্বরের মধ্যেই পাক দখলদারদের হাত থেকে বাংলার মাটি মুক্ত করতে যৌথভাবে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার সেক্টর হেডকোয়ার্টারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অবস্থানের কারণে ভারতীয় বাহিনীর সাথে হঠাৎ করে সেক্টর কমান্ডারসহ অন্যান্য অফিসারের সাথে যৌথ কমান্ডে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলাপ-আলোচনায় বুঝলাম বাংলার মাটিকে মুক্ত করার জন্য এতদিনের প্রতীক্ষিত সময় ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় এসে গেল। আক্রমণ পূর্ববর্তী জেনারেল অরোরার সাথে এবং জেনারেল দলভীর সিংহসহ বেশ কিছু ভারতীয় সেনা কমান্ডারের সাথে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের সাথে বৈঠক হয়। এর মধ্যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকবাহিনী কর্তৃক ভারতীয় ভূখণ্ড আক্রমণ করায় ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন রমজান মাসের শেষ প্রায়, ডিসেম্বর মাস কেবল আরম্ভ হয়েছে মনে পড়ে ৫/৬ তারিখ হবে। ঈদের আগের দিন রাতে ৯নং সেক্টরের সবকটি অপারেশন ক্যাম্প কমান্ডারদেরকে পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে মর্মে নির্দেশ প্রেরিত হলো সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে। ঈদের দিন সকালে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে লেঃ মোহাম্মদ আলী, লেঃ আহসান উল্লাহ, লেঃ শচীন কর্মকারের অধীনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা দখল করলো সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে অবস্থিত পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটিটি। ইতিমধ্যে ক্যাঃ বেগের নেতৃত্বে নুরুল ইসলাম মঞ্জুরসহ (তৎকালীন এমএনএ) বরিশালের কয়েকশ' মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কিছু ছোট নৌকাযোগে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বরিশালের এলাকায় পৌঁছে গেছে। ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারের তিন কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা এবং বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে অবস্থানরত কয়েকশ' মুক্তিযোদ্ধা, হিংগলগঞ্জ অপারেশন ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার বৃহৎ এলাকা আমাদের দখলে চলে এল।

দেবহাটা থানা থেকে সাতক্ষীরা যাওয়ার কালিগঞ্জ সাতক্ষীরা সড়কে পারুলিয়া ব্রিজ প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে ইতিমধ্যে আমাদের দখলে চলে এসেছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল পারুলিয়া থেকে রাতের মধ্যেই পাকবাহিনীর সাতক্ষীরার পথে অবস্থিত শক্ত ঘাঁটি কুলিয়া ব্রিজ দখল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন ক্যাপ্টেন হুদার তত্ত্বাবধানে। আমি হেডকোয়ার্টার ফোর্স নিয়ে ক্যাপ্টেন শাজাহান (দেবহাটার শাহাহান মাস্টার) এবং ইতিমধ্যে কৈখালী অপারেশন ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে লে. সলিমুল্লাহ আমাদের সাথে যোগ দিলেন। রাত ১টায় আমি ক্যা. শাজাহান এবং লে. সলিমুল্লাহ কুলিয়া ব্রিজের পাকবাহিনীর অবস্থানে হামলা ও দখলের জন্য পারুলিয়াহাটে বসে পরিকল্পনা করে রাত দুটোর মধ্যে কুলিয়া ব্রিজের দিকে এগোতে লাগলাম ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, ভোর পাঁচটার দিকে কুয়াশায় ঢাকা কুলিয়া ব্রিজের কাছাকাছি পাকবাহিনীর ঘাঁটির ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে পরিকল্পনামাফিক অবস্থান নিলাম। ডিসেম্বর মাসের শীতে কুয়াশা কেটে সূর্য উঠতে উঠতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। বাইনাকুলার দিয়ে রাজাকার ও পাকবাহিনীদের চায়ের মগ নিয়ে হাঁটাচলা এবং নাশতা খাবার দৃশ্য দেখলাম এবং এ অবস্থাতেই ওদের ওপর পরিকল্পনামাফিক তিন দিক দিয়ে আক্রমণ চালালাম। আমার সাথে থাকা এলএমজি ম্যান এবং টু-ইন্স মর্টারসহ দুই দুই চারজন ওদের উপর সমানে গুলি ও গোলাবর্ষণ করতে লাগল। বাইনোকুলার দিয়ে ওদের বেশ কিছু ধরাশয়ী লাশ কুলিয়ার ব্রিজসহ পাকবাহিনীর ঘাঁটি বলে পরিচিত কুলিয়া স্কুল ঘরের মাঠে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমরা ক্রোলিং করে গুলি করতে করতে এগোতে লাগলাম। ১০/১৫ মিনিট হবে বোধ হয় হঠাৎ করে কুলিয়া ব্রিজ থেকে সাতক্ষীরার দিকে গমনকারী রাস্তার পাশে পাকবাহিনীর আর্টিলারী পয়েন্ট থেকে আমাদের অবস্থানের উপরে ৮১ মি. মি. ও ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে অবিরাম গোলাবর্ষণ হতে লাগল। আমরা একটু সময়ের জন্য থমকে যাওয়ার মধ্যেই কুলিয়া ব্রিজে অবস্থানরত পাকবাহিনী এবং বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকার যারা জীবন্ত ও আহত ছিল তারা ব্রিজ পেরিয়ে পিছু হটতে লাগল। ততক্ষণে আমরা কুলিয়া ব্রিজের কাছাকাছি চলে এসেছি। আমাদের নিকট কোন ভারি আর্টিলারি গান না থাকায় ওদের আর্টিলারি অবস্থানের উপর আমরা হামলা করতে অসমর্থ হওয়ায় এদের প্রচণ্ড গোলার আঘাতে আমাদের অবস্থানস্থলে বড় বড় ডোবার মতো গর্ত হয়ে আমাদের ছেলেদের আহত করতে লাগল কিছুক্ষণের মধ্যে আমার দুই পাশের এলএমজি ও টু ইঞ্চি মর্টারে গোলাবর্ষণ অবস্থায় ২ জন মুক্তিযোদ্ধা

গোলার আঘাতে গুরুতর আহত হয়। আহতদের অনতিবিলম্বে পিছনের দিকে পাঠাতে লাগলাম। আমাদের অবস্থানের পশ্চিমে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাঃ মাহাবুব (এসপি মাহাবুব)-এর কাছে ভোমরা গোহাডাঙ্গা এলাকায় আর্টিলারী গানের অবস্থান ছিল। ওয়কিটকিতে তার সাথে যোগাযোগ করে ফায়ার সাপোর্ট চাইলাম আমরা এবং ১০ মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেন মাহাবুব-এর ইউনিট তিন ইঞ্চি মর্টার দিয়ে পাকবাহিনীর আর্টিলারী পয়েন্টে গোলাবর্ষণ শুরু করলেন। এ অবস্থায় তখন বোধ হয় বেলা বারোটা বেজে গেছে। ক্যাপ্টেন শাজহাহান এবং লে. সলিমুল্লাহকে আমাদের অবস্থান দৃঢ় রাখতে বলে বিনা প্রয়োজনে গোলাগুলি না করার নির্দেশ দিয়ে কালিগঞ্জে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন হুদাকে তার বাহিনী নিয়ে কুলিয়া ব্রিজের দিকে এগোবার জন্য খবর জানালাম। তার দলে দু'তিনটা থ্রি ইঞ্চি মর্টার ছিল যেগুলো কালিগঞ্জ দখলের সময় পাকবাহিনীর নিকট থেকে বেশ কিছুসংখ্যক মর্টার শেলসহ হস্তগত হয়েছিল। গোলাগুলির তীব্রতা কমে যাওয়ার ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের পেছনে একটা রাস্তার আড়ে রাখা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজনে পেছনের দিকে যখনই ক্রলিং করে পৌঁছতে শুরু করেছি, হঠাৎ পাকবাহিনী মেশিনগান দিয়ে কুলিয়া ব্রিজের ওপারে অবস্থিত একটা পুরনো দোতলা বাড়ির চিলেকোঠা থেকে আমার উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ চলল। কোনমতে গড়িয়ে রাস্তার ওপাশে অবস্থানরত আহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছলাম। স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে ভ্যানগাড়ি ও সাইকেলের পিছনে (বড় কাঠের সিটওয়ালা বাহন যাকে স্থানীয়ভাবে হেলিকপ্টার বলা হয়), সেগুলো করে আহতদের পারুলিয়া ব্রিজের দিকে পাঠিয়ে দিলাম এ সময় দেখি ক্যাপ্টেন হুদা কালিগঞ্জের অবস্থান থেকে বেশ কয়েকশ' মুক্তিযোদ্ধাসহ মর্টার নিয়ে এগিয়ে আসছেন। তার সাথে সমগ্র বিষয় আলাপ করে তার কমান্ডে পরবর্তী যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং সন্ধ্যার মধ্যে কুলিয়া ব্রিজ দখল করে ব্রিজের ওপারে অবস্থানরত সেই চিলেকোঠাওয়ালা দোতলা বাড়িটা যেখানে পাকবাহিনীর দৃঢ় অবস্থান ছিল তা আমাদের দখলে চলে এলো। সন্ধ্যার পরে সারারাত ধরে ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী গানের সহায়তায় পাকবাহিনীর কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা সড়কের কুলিয়া ব্রিজের ১ কি. মি. দূরে আলীপুরে অবস্থিত আর্টিলারি পোস্টটিও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে তা আমাদের দখলে চলে এলো। কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা সড়কের কুলিয়া নামক স্থানের সেই যুদ্ধকে এখনও স্থানীয় মানুষ 'কুলিয়া যুদ্ধ' নামে অভিহিত করে। হেডকোয়ার্টার থেকে সেক্টর কমান্ডার

মেজর জলিলের নির্দেশে পরবর্তী আক্রমণের কার্যক্রমের পরিকল্পনার জন্য রাতের শেষভাগে আমরা ইতিপূর্বে মুক্ত দেবহাটা থানা হেডকোয়ার্টারে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম। ততক্ষণে ভারতীয় বাহিনীর একটা বিশাল অংশ যা ৩২ ব্রিগেড নামে পরিচিত ছিল, তারা সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মতে পরের দিন সকালে যৌথভাবে সাতক্ষীরা দখলের জন্য যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমরা তিন দিক থেকে পরের দিন সকাল ১০টার মধ্যে পাকবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে সাতক্ষীরার তৎকালীন মহাকুমা হেডকোয়ার্টারে (পরবর্তীতে জেলা হেডকোয়ার্টার) এ পৌঁছে গেলাম।

প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সাথে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের দ্বন্দ্ব

ইতিপূর্বে ইনডাকসন প্রসেসে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র নিয়ে পাকহানাদার অধিষ্ঠিত ৯নং সেক্টর এলাকায় পাঠিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের পদ্ধতি সর্বমহলে যখন প্রশংসিত এবং হানাদার বাহিনীও এদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, তখন হঠাৎ করেই মেজর জলিলকে মুক্তিযুদ্ধের হেডকোয়ার্টারের মুজিবনগর (কলিকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে) ডেকে নেয়া হলো। সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্টাফ অফিসার হিসাবে অমি এবং সেক্টর এডজুটেন্ট ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক মেজর জলিলের সঙ্গে সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর সদর দফতরে দেখা করি। তিনি মেজর জলিলকে ইনডাকসন পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের বিপক্ষে তার মতামত ব্যক্ত করে এদের দিয়ে রেগুলার রেজিমেন্টেড ওয়েতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের পক্ষে মতামত দিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো। এদিকে ইনডাকসনের মাধ্যমে প্রতি রাতেই ঢুকছিল এক এক দল গেরিলারা ৯নং সেক্টর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে প্রচলিত গেরিলা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও আসছিল। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ইনডাকশন প্রথায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনড় রইলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে নিয়োজিত ভারতীয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের তার যুদ্ধ পরিচালনার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তাদের এ বিষয়ে সম্মত করাতে সমর্থ হলেন। প্রধান সেনাপতি ওসমানী ব্যাপারটাকে সহজভাবে না নিয়ে ৯নং সেক্টরের যুদ্ধ পদ্ধতিসহ সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের উপর বেশ ক্ষুব্ধ হন তবে ৯নং সেক্টরের যুদ্ধ পদ্ধতি ইতিমধ্যে ভারতীয়সহ পশ্চিমা সাংবাদিকদের কাছে তাদের পত্রিকার মাধ্যমে বহুল প্রচার পাওযায় সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী প্রকাশ্যে আর বিরোধিতা না করলেও এটা সেটা নিয়ে ৯নং সেক্টরের বিভিন্ন কার্য পদ্ধতিতে সমালোচনামুখর হয়ে রইলেন। এই ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটল পারুলিয়া ব্রিজ ক্যাপ্টেন বেগের নেতৃত্বে

ফ্রগম্যান কায়দায় উড়িয়ে দেবার পর পর্যুদস্ত পাকবাহিনী সেখান থেকে পিছিয়ে কুলিয়া ব্রিজে অবস্থান নেবার পর সর্বাধিনায়ক পারুলিয়া ব্রিজ পরিদর্শনে এসে ব্রিজটা উড়িয়ে দেয়া সঠিক হয়নি বলে মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন বেগের ওপর চটে গিয়ে তাদের সাথে প্রকাশ্যেই দুর্ব্যবহার করলেন। আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা কলাম যে পাকবাহিনী ইতিমধ্যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হবার পর ওদিকে যাতে আসতে না পারে তার জন্য পারুলিয়া ব্রিজ ওড়ানোর প্রয়োজন ছিল। যাহোক এই প্রকাশ্য মতান্তরের কারণে ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে খেতাব প্রাপ্তিসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে ৯নং সেক্টরের যুদ্ধের কৃতিত্বসহ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়।

যুদ্ধ জয়ের শেষ পর্ব–
খুলনায় ৮ হাজার পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

সাতক্ষীরা দখলের পর ঐ এলাকার সব রাজাকারদের সাতক্ষীরা থানার মাঠে বেঁধে জড়ো করা হলো এবং পাঠিয়ে দেয়া হলো সাতক্ষীরা জেলখানায়। পাকবাহিনীর বীরপুঙ্গবেরা সাতক্ষীরা থেকে দলবদ্ধভাবে পালিয়ে প্রথমে যশোর ও পরে খুলনায় গিয়ে অবস্থান নেয়। সাতক্ষীরা ডাকবাংলোতে যৌথ বাহিনীর অফিসারগণসহ স্থানীয় প্রশাসনের ব্যক্তিদের ডাকা হলো দুপুরের দিকে। সাতক্ষীরাকে স্থানীয় সিভিল প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে খুলনার দিকে অগ্রসরের সিদ্ধান্ত হলো। ভারতীয় বাহিনীর ৯নং ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল দলবীর সিং ভারতীয় বাহিনীর ৩২ নং ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তেওয়ারী ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এক গোপন বৈঠকে খুলনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

খুলনা শহরের নিকট রূপসা নদীর অপর তীরে আক্রমণ ব্যূহ তৈরি করার জন্য লেঃ জিয়াউদ্দিনকে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলে বাগেরহাটের সুবেদার তাজুল ইসলাম (আগরতলা মামলার এক নির্যাতিত আসামী) এর অধীনের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে লেঃ জিয়ার সাথে যোগ দেবার নির্দেশ দিলেন সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল। শত্রুপক্ষ যাতে নৌপথ ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য তেরখাদা ও মোল্লারহাটে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে খুলনার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হলো খুলনার দক্ষিণে পাইকগাছা, তালা ও আশাসুনী অঞ্চলের লেঃ আরেফিনকে। মেজর জয়নুল আবেদীনকে অন্যদিক দিয়ে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে খুলনার গল্লামারীর নিকট অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলেন সেক্টর কমান্ডার। নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হলো। ক্যাপ্টেন হুদা দুই ব্যাটেলিয়ন মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর হেডকোয়ার্টারের এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাসহ সাতক্ষীরা থেকে খুলনার দিকে

মিত্র বাহিনীর সাথে সড়কপথে অগ্রসর হলেন।

ইতিমধ্যে সাতক্ষীরায় জড়ো হওয়া কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের তিন ভাগে ভাগ করে খুলনাকে রূপসা নদীর ওপারসহ তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য এগোনোর এবং ভারতীয় বাহিনী তাদের সমর্থনে আর্টিলারি গান ও এয়ারসাপোর্ট দিয়ে এগিয়ে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত হলো। ১৪ ডিসেম্বর রাতেই অভিযান আরম্ভ হলো। আমাদের হেডকোয়ার্টার ফোর্স ভারতীয় বাহিনীর কমান্ড পোস্টের সাথেই রইল। সিদ্ধান্ত মতে আমরা ভারতীয় বাহিনীর সাথে যৌথ কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য খুলনার দৌলতপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মরহুম সবুর খানের গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন থুকরা হাই স্কুলে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ফোর্সসহ অবস্থান নিলাম। ভারতীয় বাহিনী আমাদের সমান্ত রালে অবস্থান নিয়ে তাদের আর্টিলারি গানগুলো নিয়ে দৌলতপুরের বেশ কাছে অবস্থিত ঘন খেজুর বাগানের ভিতর অবস্থান নিয়ে খুলনা-যশোর রোড দিয়ে যাওয়া চৌগাছাসহ কয়েকটি স্থানে পাকবাহিনীর পলায়নরত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ট্যাংক যুদ্ধে এবং ভারী আর্টিলারী গান ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানোর সাহায্যে পাকবাহিনীর প্রায় সব ক'টি ট্যাঙ্কসহ সমরাস্ত্রবাহী যান ধ্বংস করে দিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু সদস্য ঐ যুদ্ধে শহীদ হলেও কয়েকশ' ভারতীয় বাহিনীর সেনা ঐ সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করে। ১৫ ডিসেম্বর সারারাত ধরে খুলনার উপর ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী গান দিয়ে গোলাবর্ষণ এবং দৌলতপুরের মুখে যৌথবাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ চলে। ভারতীয় বাহিনীর এ যুদ্ধে বলিদান বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহসে উল্লেযোগ্য। রাতে কমান্ড পোস্টে বসে রেডিওতে পাকবাহিনীর প্রতি আত্মসমর্পণের জন্য ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশার প্রচরিত ঘোষণা শুনলাম। আমাদের কাছে খবর এলো ১৬ তারিখ ঢাকাতে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে কিন্তু ১৬ তারিখে ঢাকার পতন হয়ে রেসকোর্সে পাকবাহিনী যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় জড়ো হওয়া হাজার হাজার পাকবাহিনী এবং সাথে কয়েক হাজার রাজাকার, আলশামস, অলবদর বাহিনী এবং খুলনার অধিকাংশ অবাঙালি বিহারী খুলনা শহর রক্ষায় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ১৬ ডিসেম্বর খুলনা মুক্ত হলো না, যুদ্ধ চলতে লাগল। যশোর বিনা যুদ্ধে পতন হওয়ায় ওখান থেকে পাকবহিনীর বেশকিছু সৈন্য ঢাকার দিকে পালিযে যায়। বাকিরা এসে অবস্থান নেয় খুলনায়। ১৬ তারিখ সারাদিন পাকবাহিনী খুলনার যুদ্ধক্ষেত্রের ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান নিয়ে

রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও স্থানীয় বিহারীদের সহায়তায় যুদ্ধ চালাতে থাকে। সেক্টর কমান্ডারদের পূর্ব নির্দেশ মতে ইতিপূর্বে সাতক্ষীরা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল এক বাহিনী খুলনার গল্লামারীর দিক থেকে খুলনা প্রবেশের জন্য যুদ্ধ চালায় ১৬ তারিখ সারাদিন। অন্যদিকে রূপসা নদী পার হয়ে নৌকাযোগে বাগেরহাটের দিক থেকে খুলনায় প্রবেশের জন্য যুদ্ধ চালাতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। আমাদের যৌথবাহিনীর কমান্ড পোস্টের কমান্ডে ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহায়তায় রকেট হামলা করে দৌলতপুরের প্রবেশের মুখে অবস্থানরত পাকবাহিনীর বাংকারগুলোকে ধ্বংস করে দৌলতপুরের দিকে যৌথ বাহিনী এগোতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর সারারাত খুলনাসহ দৌলতপুরের আকাশ আলো করে যৌথবাহিনীর আর্টিলারিসহ সম্মুখ যুদ্ধের আক্রমণ ও ওদের পাল্টা জবাব চলল। ভোর রাতের দিকে ওদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লো। খুলনা শহর চারদিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা এবং ভারতীয় বাহিনীয় ঘিরে যৌথ কমান্ডের নির্দেশের অপেক্ষায় রইল। ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৭টার দিকে আমরা কমান্ড পোস্টে খবর পেলাম পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে চায়। ইতিমধ্যে দৌলতপুর যৌথবাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী দখল করে নিল। দৌলতপুরের বেশ বড় একটা দালানের ছাদে ৩২নং ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেড তাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করল। সকাল ৮টার দিকে আমরা খবর পেলাম পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে ভারতীয় যৌথ বাহিনীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দৌলতপুরের উল্লিখিত স্থানে ৯নং সেক্টর থেকে মেজর জলিলকে তার সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নিয়ে অনতিবিলম্বে যেতে। যুদ্ধে ব্যবহৃত আমাদের বাহক গাড়িগুলো পিছনে ফেরে এসেছিলাম। সিদ্ধান্ত হলো সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, সেক্টর টোয়াইসি ক্যাপ্টেন হুদা, স্টাফ অফিসার হিসেবে আমি এবং সেক্টর মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন সাজাহান (পরে অবঃ মেজর জেনারেল) মুক্তিযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটি নিয়ে দৌলতপুর যাব। ৯টার মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছলাম উল্লিখিত দালানের ছাদে সিঁড়ি লাগিয়ে খোলা তাঁবু খাটিয়ে ভারতীয় ডিভিশন কমান্ড ও ৩২নং ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুম স্থাপন করেছে ভারতীয় বাহিনী, ঐ নির্ধারিত স্থানে আমরা চলে এলাম। সেখানে একটা হেলান দেয়া চেয়ারে ভারতীয় বাহিনীর ৯নং ডিভিশন কমান্ডার জেনারেল দলবীর সিং, ৩২নং ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তেওয়ারীসহ ভারতীয় বাহিনীর বড় মাপের কিছু অফিসার বসা তার মধ্যে ৩২নং

ব্রিগেড মেজর (বিএম) সবুজ পাগড়ি ও জালী দেওয়া দাড়িওয়ালা মেজর বেদীকে বসা দেখলাম। আমরা পূর্বেই এদের সাথে গত ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে বহুবার একত্রিত হয়েছি। খুলনা শহরের ভারতীয় বাহিনীর সংরক্ষিত একটা ম্যাপ একটা ব্ল্যাকবোর্ডের সাথে সাঁটানো। আমাদের সাথে পরিচয় পর্ব শেষে আমরা বসলে জেনারেল দলবীর সিং ৯ম ডিভিশন কমান্ডার ও যৌথ বাহিনীর ঐ অঞ্চলের ভারতীয় বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করলেন যে পাকবাহিনী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স পেলে গাড়ি করে পাকিস্তানি বাহিনীর খুলনা এরিয়ার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানসহ সহ-অধিনায়ক কর্নেল সামস্‌সহ ৭ জন লেঃ কর্নেল এবং পাকবাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এখানে আসবেন। সিদ্ধান্ত মতে তাদের আসার জন্য খবর জানানো হলো। ওদের আসতে যাতে কোন বাধার সম্মুখিন না হতে হয় তার জন্য ভারতীয় বাহিনীর একটি দল তাদের আসার জন্য কয়েকটি জিপ নিয়ে এগিয়ে চলল খুলনার দিকে। খুলনার নিকটবর্তী পাকবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পাকবাহিনীর অফিসাররা আত্মসমর্পণের পূর্বে অবস্থান করছিল।

পাক আত্মসমর্পণকারী অফিসার প্রতিনিধিদের সাথে পরিচয় ও করমর্দন শেষ হবার পথে। পাকবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ খান ভারতীয় বাহিনীর ঐ এলাকার যুদ্ধ পরিচালনাকারী ৩২নং ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তেওয়ারীর সাথে করমর্দনের জন্য কাছাকাছি হতেই হঠাৎ দু'জনেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একে অন্যের দিকে বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর দু'জন দু'জনের নাম ধরে চিৎকার করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে উর্দু, হিন্দি, ইংরেজিতে যা বললেন, তাহলো এ রকম হায়াৎ– 'তেওয়ারী হো তোম'? তেওয়ারী– 'আবে, হায়াৎ তুম ইহা ক্যায়সে'। পরে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আবেগের অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে বলতে লাগলো 'আরে ভাই এতনা দিন বাদ হাম দো নোকো মোলাকাত ইস হালাৎ মে'? আমরা উপস্থিত সকলে দু'বাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডারদের এ কাণ্ড দেখে হতভম্ব। জেনারেল দলবীল সিংও উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন Tewari, Hay Friends what happened. অশ্রু সজল নেত্রে দু'জনের পক্ষে ব্রিগেডিয়র তেওয়ারী তার ডিভিশন কমান্ডারকে যা বললেন তা আরো উত্তেজনাকর। এই দুই ব্রিগেডিয়ার ব্রিটিশ সরাকরের শেষ সময়ে বর্তমান পাকিস্তানের কাকুল অফিসারস ট্রেনিং

একাডেমীতে একই ব্যাচে একই সঙ্গে এবং অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এক কক্ষেই ছিলেন। এতদিন পর এ দু'জনের অবসর গ্রহণের পূর্ব সময়ে শত্রুভাবাপন্ন দুই বাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দু'জন দু'জনকে এই পরিবেশ সাক্ষাৎ হওয়ায় দু'জনকেই সেই তরুণ বয়সের প্রথম জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এ অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যাহোক এরা দু'জনসহ সবাই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে জেনারেল দলবীর সিংহের আহ্বানে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানালেন। আলোচনা ২৫/৩০ মিনিট চলল। সিদ্ধান্ত হলো পাকবাহিনীর কমান্ডারদের দুটি জীপ সামনে রেখে ভারতীয় বাহিনীসহ আমাদের অফিসাররা খুলনা প্রবেশ করবে। ৮০০০ পাকবাহিনীর পক্ষে তাদের কমান্ডাররা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমেত খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে যৌথবাহিনীর নিকট সামরিক কায়দার আত্মসমর্পণ করবে, বাকি পাসসেনারা নিরস্ত্র অবস্থায় নির্দিষ্ট জায়গায় প্রহরারত অবস্থায় থাকবে। সিদ্ধান্ত হলো উভয় বাহিনীর অফিসাররা খুলনার পাকবাহিনীর কমান্ড হেডকোয়ার্টার খালিশপুরে অবস্থিত সিএন্ডবি অফিসে সর্বপ্রথম অফিসিয়াল রীতি অনুযায়ী বসে দালিলিক কার্য সম্পাদন করে তারপর খুলনার সামরিক দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন যৌথ বাহিনীর নিকট এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হলো সার্কিট হাউস ময়দানে ৮ হাজার পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কার্যালয়ে কথা চলাকালে হঠাৎ সবাই অনুভব করলেন যে, বেসামরিক দায়িত্ব অফিসিয়াললি বুঝে নিতে হলে খুলনার ডেপুটি কমিশনারের উপস্থিত প্রয়োজন। খবর পাওয়া গেল তিনি খুলনা শহরের রূপসা নদী সংলগ্ন জেলা প্রশাসকের বাংলোতে অবস্থান করছেন। যৌথ কমান্ডের সিদ্ধান্ত মতে, আমাকে, খুলনার ডিসিকে গ্রেফতার করে আনার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের এক চৌকস দল নিয়ে পাঠানো হলো। পাকবাহিনীর অফিসারদের ব্যবহৃত একটা জিপ আমাকে ৫/৬ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ এবং একটি ১ টনি ট্রাকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমার সাথে রওনা হলো। আমাকে ব্যবহারের জন্য দেয়া জিপের ড্রাইভার দেখলাম পাকবাহিনীর পোশাক পরিহিত সৈনিক। তার ড্রাইভিং সিটের পাশে একটা গুলিভর্তি চাইনিজ একে ৪৭ (এসএমজি) ড্রাইভার আমাকে স্যালুট দিয়ে জানালো সে বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সদস্য। আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম যে বেলুচ রেজিমেন্টের পাঠান পাক সেনাদের পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ক্ষোভ ছিল। তাকে বললাম পাক আর্মির পোশাক খুলে ফেলে তার দখলে থাকা এসএমজিটা

আমার কাছে দিতে। ওটা হাতে নিয়ে শরীরটা শিহরিত হয়ে উঠল যে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে ওদের ব্যবহৃত একটা অস্ত্র হাতে নিতে পারলাম। আমরা খালিশপুর থেকে খুলনা শহরের দিকে সঙ্গীয় ট্রাকসহ গাড়ি করে এগোতে লাগলাম। ড্রাইভার শুধু বলতে লাগলো যে সে পাঠান, তাকে তো মারা হবে না? আশ্বস্ত হয়ে গাড়ি দ্রুত চালাতে লাগল সে। মাঝে মধ্যে তার স্ত্রী, মা বাবা আর সন্তানের কথা আওড়াতে লাগল। আমি ধমক দিতে সে চুপ হয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে এসেছে। সবাই জয় বাংলা ধ্বনি দিচ্ছে। কেউ কেউ ফাঁকা গুলি ছুড়ছে। বৈকালী সিনেমার সামনে চলে এসেছি তখন হঠাৎ গাড়ি থামালাম। চিন্তা হলো পাকবাহিনীর জিপে ও ট্রাকে করে আমরা খুলনা অভিমুখে যাচ্ছি, ভুল করে যদি আমাদের গাড়িকে পাকবাহিনীর গাড়ি মনে করে, ইতিমধ্যে খুলনায় প্রবেশকৃত মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে বসে। বৈকালী সিনেমা হলের মোড়ে গাড়ি থামাতেই আমাদের দেখে হাজার হাজার জনতা জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে স্বাধীন বাংলার মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যবহৃত পতাকা হাতে এগিয়ে এলো। আমি আমার সাথের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জনতার নিকট থেকে দুটো মাঝারি সাইজের পতাকা নিয়ে উভয় গাড়ির সামনে বাঁশের ছোট দণ্ডের সাথে বেঁধে লাগিয়ে দিলাম। চালিয়ে দিলাম গাড়ি খুলনার ডিসির বাড়ির দিকে। রাস্তার দু'ধারের লোকজন জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। গাড়ি নিয়ে রূপসা নদী সংলগ্ন ডিসির বাংলোতে ঢুকলাম। নিচ থেকে ডিসি সাহেব আছেন কিনা উচ্চ স্বরে ডাক দিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে স্যান্ডেল পায়ে নেমে এলো খুলনার ডিসি। ভদ্রলোক স্বাধীনতার পর '৭৫ পরবর্তীকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ আমলা হয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে সকালে গোসল করতে গিয়ে সাগরের পানির ভাটার টানে ডুবে গিয়ে মারা গেছেন। ডিসি সাহেব নেমে এসে তিনিই খুলনার ডিসি বলে নিজেকে পরিচয় দিলেন। তাকে হাইকমান্ডের নির্দেশ জানিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যৌথবাহিনীর সমর নায়কেরা খুলনার সিএন্ডবি অফিস এলাকায় যে স্থানে অবস্থান করছিলেন সেখানে নিয়ে যাবার কথা জানালান। তিনি কোন প্রতিউত্তর না করে নেমে এলেন আমার সাথে ডিসির বাংলো থেকে। আমাকে অত্যন্ত নম্রভাবে অনুরোধ করলেন যে, তিনি তার ব্যবহৃত জেলা প্রশাসকের গাড়িতে করে যেতে পারবেন কিনা। মনটা নরম হলো, তাকে অনুমতি দিলাম

তার গাড়িতে করে আমাদের সাথে আসতে। ১৫/২০ মিনেটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ডিসিকে নিয়ে খুলনার সিএন্ডবি অফিসে। সবাই তখন ঐ অফিসের একটা বড় কামরায় বসা। ডিসি তাদের কাছে পৌঁছতে তাকে সময় না দিয়ে যৌথবাহিনীর তরফ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তার বাংলোতে অবস্থান করে যেভাবে তাকে নির্দেশ দেয়া হবে সেভাবে খুলনার ডিসির দায়িত্ব পালন করবেন বলে নির্দেশ দেয়া হলো। তাকে কিছু ফোর্স দিয়ে তার বাংলোতে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

মেজর জলিলের ভাষ্যে খুলনার আত্মসমর্পণ

জেনারেল দলবীর সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কেননা, প্রধান স্টাফ অফিসার, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে ইতিমধ্যেই রওয়ানা হয়েছেন, এখনও এসে পৌঁছাননি। সময় অতি মন্থরগতিতে চলতে লাগলো। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি ঘণ্টা। মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার কর্নেল দেশপান্ডে জেনারেল দলবীর সিংকে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তাঁর সাথের সাতজন লে. কর্নেল এসে পৌঁছে গেছেন'।

উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। জেনারেল দলবীর সিং গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন, 'ওদের এখানে নিয়ে আসুন।' আমরা হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর ছাদে ছিলাম। নিচের দিকে তাকাতেই দেখলাম সাংঘাতিক অবস্থা। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ফটোগ্রাফাররা এতদিন ধরে পাগলের মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যাদের ছবি তোলার জন্য তাদের পেয়ে সমানে ক্যামেরার ফ্লাস জ্বালিয়ে ছবি তুলছে।

যা হোক, পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে আসা হলো। আমি চারদিকে তাকাচ্ছিলাম– ওদের ভেতর আমার চেনাশোনা কেউ আছে কিনা। হ্যাঁ, ওদের ভেতর আমার চেনা দু'জন ছিল। একজনের নাম লে. কর্নেল ইমতিয়াজ ভয়ায়েচ। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম তখন ওখানে তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরজন লে. কর্নেল শামস। তার সাথে আমার জানাশোনা ছিল। ব্রিগেডিয়ার হায়াতকেও একবার কি দু'বার পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছি। তখন তাদের মনে হতো খুব ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু বাংলাদেশে তারাই অভদ্র, অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। বসতে তাদের চেয়ার দেয়া হলো। জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন ওদের সাথে। বিজয়ী ও বিজিতের কোনো সামঞ্জস্য রাখলেন না। তিনি ওদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। জেনারেল দলবীর সিং-এর মার্জিত রুচিবোধ ও

ব্যবহার দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি ব্রিগেডিয়ার হায়াতের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে ইনি হচ্ছেন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার, আগে আপনাদেরই একজন ছিলেন।'

আত্মসমর্পণের খুটিনাটি বিষয় সমাপ্ত হলো। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তাঁর ব্রিগেড মেজরকে ডেকে বললেন, 'মেজর ফিরোজ, তুমি এখনই চলে যাও এবং সৈন্যদের হুকুম শুনিয়ে দাও, যে যেখানে আছে সেখানেই অস্ত্র সংবরণ করতে। ওদের বলে দাও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।'... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী ইতালীর সৈন্যের মতো হানাদাররা দীর্ঘ লাইন দিয়ে চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমরা খুলনা শহরের ভেতরে ঢুকলাম। সেখানে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের হেডকোয়ার্টারে গেলাম। চারদিক শান্ত, নীরব। মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ারের তত্ত্বাবধানে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে এলো। চেয়ারে বসে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্ব পাকিস্তানে বসে শেষবারের মতো এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া দেয়ার মতো আমার আর কিছুই নেই।'

'মৃত পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ বলবেন কি?' আমি এ কথা বলতেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত অসহায়ের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলেন। উপায়ান্তর না থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তার ভুল সংশোধন করে নিলেন। চা খেয়ে আমরা সবাই সার্কিট হাউসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দকর। আমরা খুলনা শহরের সার্কিট হাউজের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার দু'পাশের লোকজন গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে আমাদের স্বাগত জানালো।

'জয় বাংলা' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। আজ মনে হলো, জয় বাংলা বাস্তব সত্য। প্রত্যেক বাড়ির চূড়ায়, দোকানে বাংলাদেশের পতাকা। প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। হাত নেড়ে উল্লসিত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিলাম। সবার মুখেই হাসি। শিগগিরই আমরা সার্কিট হাউসে পৌঁছলাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এদিকে আসতে লাগলো। সার্কিট হাউসের উপরে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুকটা ফুলে উঠলো। সমুন্নত পতাকার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। হাজার হাজার উৎসুক মানুষ সার্কিট হাউস ঘিরে রয়েছে এবং সবাই সামনে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা নিরীহ বাঙালীদের ওপর এতিদন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের এক নজর দেখার জন্য জনতা বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছুটে আসতে চাইলো। জনতার অসম্ভব ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু জনতার চাপ এত বেশি যে, মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই সামলাতে পারছে না। সার্কিট হাউসের দরজায় নামতেই এত ভীড়ের মধ্যেও পিস্ট হতে হতে জনতা আমাদের দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কেউ আনন্দে হাততালি দেয়, কেউ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, কেউ বা পাগলের মতো ছুটে এসে চুমো খায়। কি অপূর্ব দৃশ্য! মানবতার কি মহান বহিঃপ্রকাশ! সব হারাবার দুর্বিষহ জ্বালা ভুলে গিয়ে নতুন দিনের সূর্যকে কত আপন করে কাছে নিতে চায়। মহামানবের তীর্থ সলিলে অবগাহন করে অবহেলিত জনতা আজ যে নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা আজ মুক্ত, ওরা স্বাধীন। প্রতিটি জিনিস আজ ওদের নিজস্ব। ইতিমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার জেনারেল দলবীর সিংহকে নিয়ে সার্কিট হাউসের মাঠে অবতরণ করলো। লম্বা, উন্নত চেহারার অধিকারী দলবীর সিং সার্কিট হাউস পর্যন্ত হেঁটে আসলেন এবং আত্মসমর্পণ পর্বের খুটিনাটি বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। সবুজ ঘাসের উপর লাল কার্পেট বিছানো। তার উপর একটি টেবিল ও একটি চেয়ার।

ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সমাগত। সুশিক্ষিত আট হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ। যে দাম্ভিক পাকিস্তানী সৈন্যরা হিংস্র কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতো তারা আজ নিরীহ মেষশাবকের মতো আত্মসমর্পণ করলো। জেনারেল দলবীর সিং চেয়ারে উপবিষ্ট। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার সাথের আটজন কর্নেল নিয়ে মার্চ করে তার সামনে এসে থামলেন। পাকিস্তানী কমান্ডাররা যখন সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল, তখন বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার লোক আনন্দে ফেটে পড়লো। কেউ হাততালি দেয়। কেউবা শিস দেয়। গ্লানিকর পরাজয়! কত বড় শাস্তিমূলক অনুষ্ঠান! জেনারেল দলবীর সিং এর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম আত্মসমর্পণকারী সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিদা। জেনারেল দলবীর সিং আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ করলেন এবং পাকবাহিনীর পরাজিত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান মাথা নুইয়ে কম্পিত হাতে দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। এরপর ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তার সাথের অন্যান্য অফিসারগণ

সামরিক নিয়মে কোমরের বেল্ট খুলে মিত্রবাহিনীর কাছে অর্পণ করলেন। এ সময় সমস্ত ফটোগ্রাফার ফটো নেয়ার জন্য উঠেপড়ে গেলে গেলেন। দেখে মনে হলো যেন একটা বিয়ের পর্ব। উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পক্ষে এ রকম গ্লানিকর আত্মসমর্পণ আমি আর কখনও দেখিনি! অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয়!

ষড়যন্ত্রের আগাম লক্ষণ– পূর্বশত্রুতার জের

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সাথে ৯নং সেক্টরের সার্বিক কার্যাবলী নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি মেজর জয়নুল আবেদীন নামে একজন পাকিস্তান ফেরত সেনা অফিসারকে ৯নং সেক্টরের সহঅধিকায়ন করে পাঠালেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে এক ফরমান পাঠালেন সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যে ৮ ও ৯নং সেক্টরের তত্ত্বাবধানকারী একজন সুপারভাইজারি কমান্ডার নিযুক্ত করেছেন। যার নাম কর্নেল মঞ্জুর (যিনি পরবর্তীতে জেনারেল মঞ্জুর হিসেবে চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানকে হত্যা ও বিদ্রোহের নায়ক হিসেবে পরে স্থানীয় সেনাদলের গুলিতে নিহত হন) তার হেডকোয়ার্টার থাকবে ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার যশোর এলাকায়। তখন যুদ্ধের যা অবস্থান এসব নিয়ে আমরা মোটেও মাথা না ঘামিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম খুলনা দিকে। মেজর জয়নুল আবেদীনকে খুলনা অভিযানে গল্লামারিমুখী মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার করে পাঠানো হলো। কর্নেল মঞ্জুর একদিন ডিসেম্বরের আগে এলেন ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে এসে সদ্যমুক্ত কালিগঞ্জের উকসা বিওপি ঘুরে দেখে আবার যশোর অঞ্চলের ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে চলে গেলেন। কর্নেল মঞ্জুর ও মেজর জয়নুল আবেদীনকে যে মেজর জলিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য ওসমানী সাহেব পাঠিয়েছিলেন তা টের পেলাম খুলনা মুক্ত হবার পরপরই। তারা ষড়যন্ত্র করে সড়কপথে আমাদের ঢাকা যাবার সময় মেজর জলিলসহ ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ও অফিসার ৮নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অফিসারদের হাতে যশোরের প্রবেশ পথে কর্নেল মঞ্জুরের নির্দেশে গ্রেফতার করে যশোর সার্কিট হাউসে বন্দি অবস্থায় নেয় হয়। ঘটনাটি বঙ্গবন্ধুর দেশে প্রত্যাবর্তনের সাত দিন আগে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বন্দি মুক্তিযোদ্ধারা

খুলনা মুক্ত হবার পর খুলনা সার্কিট হাউসে আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হলো। হেডকোয়ার্টার ফোর্সদের থাকার জন্য নির্ধারণ করা হলো খুলনা শহীদ হাদিস পার্কের উত্তর পাশে খান এ সবুরের প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড ক্লাবে। সেখানে হেডকোয়ার্টারের দপ্তরসহ হেডকোয়ার্টার ট্রুপসদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। মেজর জয়নুল আবেদীন কর্নেল মঞ্জুরের নির্দেশে অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় সেক্টরের সব ধরনের কাজে হস্তক্ষেপ শুরু করল। খুলনা সার্কিট হাউসে মূলত সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর জলিল এবং সাথে আমিসহ কয়েকজন ৯নং সেক্টরের অফিসাররা অস্থায়ী আবাসন হিসেবে অবস্থান করছিলাম। খুলনা পতনের পর দলে দলে বিভিন্ন মিডিয়ার বহির্দেশীয় সাংবাদিকরা মেজর জলিলের সাথে দেখা করে তার সেক্টরের যুদ্ধের বিষয়ে সাক্ষাতকার নিতে প্রতিদিনই আসতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ও এরা বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আসতো খবর সংগ্রহে এবং আমার সহায়তায় সেক্টরের মুক্তাঙ্গনের খবর সংগ্রহ করতে যেত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। খুলনা পতনের দুই দিন পর হঠাৎ করে কর্নেল মঞ্জুর এলেন খুলনা সার্কিট হাউসে মেজর জলিলের সাথে তার জরুরি আলাপ আছে উল্লেখ করে। মেজর জলিল তখন খুলনা সার্কিট হাউসের বড় ড্রইং রুমে বিদেশী সমবেত সাংবাদিকদের নিকট সর্বশেষ সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত। আমি কর্নেল মঞ্জুরকে মেজর জলিলের বেডরুমে একটা সোফায় বসালাম। মেজর জলিল মঞ্জুরের আসার খবর পাওয়ার পরও তার সাথে তখন কথা না বলায় তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। আমাকে তার ক্ষুব্ধতার কথা জানিয়ে মেজর জলিলকে তার সাথে যোগাযোগ করার কথা বলে রাগতভাবে বেরিয়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠে সোজা তার হেডকোয়ার্টার যশোরে চলে গেলেন। দুই কমান্ডারের মধ্যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ লেগে গেল আঁচ করলাম। কর্নেল মঞ্জুর যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন যে, তাকে ইনসালটেশনের জন্য তিনি মেজর জলিলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। এই কর্নেল

মঞ্জুর মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্তির পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন এবং জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে ৯নং সেক্টরের সুপারভাইজারির দায়িত্ব নিয়ে ৮নং সেক্টরে আসেন। একই সময় জেনারেল ওসমানী মেজর জয়নাল আবেদীনকে ৯নং সেক্টরের সহঅধিকায়ক করে পাঠান। এ সব কিছু যে মেজর জলিলের বিরুদ্ধে ওসমানীর শাণিত অস্ত্র আমিসহ অন্য অফিসাররা মেজর জলিলকে শত বুঝিয়েও বিশ্বাস করাতে পারিনি। তিনি শুধু বলতেন গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশকে স্বাধীন করতে হলে স্থানীয় কমান্ডারের সিদ্ধান্ত বা মতামত ছাড়া উপরস্থ কমান্ড কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না। আজও বুঝতে পারলাম না সেদিন কোনটা সত্য এবং সঠিক ছিল। ইতিমধ্যে মেজর জলিলসহ আমরা বরিশালে গিয়ে ঘুরে এসেছি আইডব্লিউটিএর একটা দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটর বোটে। বরিশালে মেজর জলিলকে হেমায়েত উদ্দিন খেলার মাঠে গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। দু'দিন আমরা বরিশাল ছিলাম। খুলনা ছাড়ার আগে সেক্টরের দায়িত্বরত মেজর জলিল সেক্টর টোআইসি ক্যাপ্টেন নূরুল হুদার কাছে দিয়ে যান। বরিশালে বাবা-মা, আত্মীয়দের সাথে দেখা করে মেজর জলিলের সাথে আবার নৌপথে খুলনায় ফেরা। ২/৩ দিন পর বিকেলে খুলনার ডিসির ঘাটে যখন আমাদের বোট ভিড়লো তখন ক্যাপ্টেন হুদা (তাকে বরিশাল যাবার আগে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের দায়িত্বে রেখে যাওয়া হয়েছিল) গাড়ি নিয়ে ঘাটে এসে মেজর জয়নুল আবেদীন মেজর জলিলের বিরুদ্ধে তার পরিবর্তে নিজেকে সেক্টর কমান্ডার দাবি করে বেশ কিছু পদক্ষেপ এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে কর্নেল মঞ্জুর এসে এই দায়িত্বের সপক্ষে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করলেন। মেজর জলিলসহ ঐ রাতেই আমরা সেক্টরের উপস্থিত অফিসাররা আমাদের স্থাপিত সেক্টর হেডকোয়ার্টার ক্যাম্প 'ইউনাইটেড ক্লাবের' দোতলায় একটা বদ্ধ ঘরে গোপন বৈঠকে বসলাম। সেখানে বসে সিদ্ধান্ত হলো বঙ্গবন্ধু না ফেরা পর্যন্ত মেজর জলিল কর্নের মঞ্জুরের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবেন যাতে তিনি কোন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে না পারেন। রাতে গোপন বৈঠকে বসা অবস্থায়ই মেজর জলিল কর্নেল মঞ্জুরের টেলিফোন পেলেন যে, বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছাবার পূর্বেই জেনারেল ওসমানী সব সেক্টর কমান্ডারদের ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন এবং যশোর থেকে একটা কার্গো বিমানযোগে কর্নেল মঞ্জুরের সাথে মেজর জলিলকে ঢাকা যাওয়ার জন্য পরের দিন সকালেই যশোর পৌঁছাতে বললেন। মেজর জলিলসহ উপস্থিত সবাই কর্নেল মঞ্জুরের কথায়

ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। মেজর জলিল মঞ্জুরকে বললেন তিনি একা যেতে পারবেন না, তার সাথে আমিসহ আরো ২/৩ জন অফিসার যাবেন এবং প্লেনে যেহেতু অন্যদের স্থান সঙ্কুলান হবে না সেহেতু পরদিন সকালে গাড়িযোগে তিনি ঢাকায় যাবেন। তার এ কথায় পরবর্তীতে মেজর জলিলের বিরুদ্ধে যে কতবড় ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি হয়েছিল তা পরদিন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা গোপন বৈঠকে বসলাম। সিদ্ধান্ত হলো সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, সেক্টর স্টাফ অফিসার হিসেবে আমি, লেফটেন্যান্ট আহসান উল্লা, মেডিকেল কোরের ক্যাপ্টেন সাজাহান এবং ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিনসহ বাছা বাছা চৌকস ৯ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটা প্রাইভেট কার এবং একটা মাইক্রোবাসে করে পরদিন ভোরে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবো। ঠিক হলো ১টা প্রাইভেট টয়োটা করোনা কারের পিছনে মাঝখানে মেজর জলিল এবং দু'পাশে আমি ড. ক্যাপ্টেন সাজাহান (সর্বশেষ জানামতে সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অবসরে গেছেন) এবং সম্মুখের সিটে লেফটেন্যান্ট আহসানউল্লাহ থাকবে। আমাদের ঠিক পেছনেই মাইক্রোবাসে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন ৯ জন বাছাই করা চৌকস মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন। মেজর জলিল আমাদের সবাইকে একটা করে মাঝারি ব্যাগ বা বক্স এবং প্রতিটিতে যে যে ধরনের অস্ত্র বহন করবে তার বুলেট বহন করতে নির্দেশ দিলেন। যে কথা সেই কাজ। রাত ২টার মধ্যে সবাই সিদ্ধান্ত মতে প্রস্তুত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লাম ঐ ক্লাব ঘরে। রাতেই খুলনার এক ব্যবসায়ীর একটা টয়োটা কার তৎকালীন নতুন মডেলের করেনো এবং একটা বড় ধরনের মাইক্রোবাস হাজির করা হলো। শুতে যাবার আগে আমি একটা রেকসিনের ব্যাগে একটা প্যান্ট, একটা শার্ট আর তোয়ালে নিচে ভরে তার ওপর আমার বহনকৃত একে ৪৭ চাইনিজ এসএমজির গোটা দশেক গুলি ভর্তি ম্যাগজিন ভরে নিলাম। মেজর জলিল একটা ব্যাগে ৯নং সেক্টরের কিছু জরুরি কাগজপত্র ও গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি বই নিলেন এবং একটা বেল্টের সবগুলো খাপে রিভলভারের গুলি ভরে নিলেন। ক্যাপ্টেন সুলতানের নেতৃত্বে ৯ জন এফএফের একটি চৌকস দল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এরশাদ সরকারের সাবেক মন্ত্রী সর্বশেষ জাপা (এরশাদের) মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ঐ সময় অত্যন্ত তরুণ বয়স তার এবং বিচ্ছু আলম এবং নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন ছাত্রনেতা বাচ্চুসহ (সকলের নাম মনে নেই) কয়েজন

অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা। এলএমজিসহ প্রত্যেকেই পাকবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নিল। ক্যাপ্টেন হুদাকে ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার ফোর্সসহ তার অধীনের এফএফদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর সার্বিক দায়িত্ব অফিসিয়াললি তাকে সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডারের দায়িত্ব হস্তান্তর করে পরের দিন ভোর ৮টার মধ্যে যশোর রোড ধরে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। মনে মনে আমাদের মধ্যে যে কোন ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত থকলেও আমরা একবারও ভাবিনি যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পুরো ঢাকাগামী দলটির স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম বন্দিত্ব জীবন শুরু হবে। গাড়ি দুটো চলছে, সামনে আমাদের টয়েটা করোনা কার আর অল্প দূরত্ব রেখে চলছে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিনসহ ১০ জন মুক্তিযোদ্ধার প্রটেকশন দল। সারারাত ঘুমোতে পারিনি বিধায় গাড়ি ঘণ্টাখানেক চলার মধ্যেই গাড়ির সবাই আমরা একটা ঝিমুনির মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করল। চেয়ে দেখি পিছনের মাইক্রোটা একটু পিছনে পড়ায় দেখা যাচ্ছে না। সবাই ফিরে চেয়ে দেখলাম বেনাপোলে যাবার ও যশোর শহরে প্রবেশের রাস্তার একটু আগে রাস্তার দু'পাশে কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। অবস্থা দেখে বুঝলাম আমরা এমবুশে পড়েছি। হাতের চাইনিজ অটো এসএমজি একে ৪৭টা ফায়ারিংয়ের জন্য কক করলাম। অন্যরা যার যার অস্ত্র চালানোর জন্য প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ দাড়িওয়ালা একজন ছিপছিপে যুবকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলল। আমি এমএমজি দিয়ে ফায়ার করার জন্য তাক করলাম। মেজর জলিল আমাকে হাত দিয়ে টিপ দিলেন গুলি না চালানোর জন্য। রাস্তার দু'ধারে ঝোপের মধ্যে ফায়ারিং পজিশনে অবস্থানরত ১৫/২০টা এলএমজি তাক করা অবস্থাটা আমাকে দেখালেন। দাঁড়িওয়ালা যুবকটির সাথে থাকা সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের অস্ত্র সংম্বরণ করতে বলল। এর মধ্যেই পেছনের ক্যাপ্টেন সুলতানের নেতৃত্বে মাইক্রোবাসটিও আমাদের পিছনে এসে পৌঁছাল তাদের গাড়িও একই কায়দায় ঘিরে ফেলা হলো। গাড়িতে আগত এফএফ বাহিনীর সদস্যরা ক্যাপ্টেন সুলতানের নেতৃত্বে অবরোধকারীদের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য হুঙ্কার দিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করলো অন্য পক্ষও মারমুখী। তখন সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় মেজরর জলিল উচ্চস্বরে বললেন, 'সুলতান ডোন্ট ফায়ার।' মাইক্রোতে বহনকারী বাহিনীর আক্রমণের উদ্যোগ স্থগিত হলো। আমাদের ঘিরে রাখা

২০/২৫ জনের সশস্ত্র দলটি উদ্যত এলএমজিসহ আমাদের সবাইকে নিরস্ত্র করে আমাদের গাড়ির সম্মুখে ও মাইক্রোর পিছনে দুটো গাড়ি আমাদের এসকর্ট করে যশোর সার্কিট হাউসে নিয়ে গেল এবং অস্ত্রের মুখে ওখানকার একটা বন্ধ কক্ষে আমাদের ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম শ'খানেক পোশাকধারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য আমাদের বন্দি স্থান যশোর সার্কিট হাউসটাকে ঘিরে সংলগ্ন রাস্তা সাধারণের চলাচলের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। ১০ ফুট বাই ১০ ফুট অন্ধকার একটা ঘরে আমরা সেক্টর কমান্ডার এমএ জলিলসহ ১৭ জন ঠাসাঠাসি করে হতবিহ্বল অবস্থায় বসে রইলাম। দিনের আলোতে বন্ধ ঘরের মধ্যে অন্ধকার তখনো কাটেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে অনুভব করলাম ঐ ঘরটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল খাট, দুটো সিঙ্গেল সোফা আর তিন চারটা চেয়ার যাতে আমরা ঠাসাঠাসি করে বসে আছি।

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ৯ মাসের দীর্ঘ মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের কেন এই বন্দিত্ব, নিজের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম না। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সপ্তাহখানেক পরের এই ঘটনা তখন আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক অবস্থা কারও একক দায়িত্বে না থাকায় হঠাৎ মনে হলো যারা আমাদেরকে বন্দী করল তাদের উদ্দেশ্য যেহেতু সৎ নয় তাই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং জীবন সম্পর্কে শঙ্কা বাড়তে লাগল। মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে দরজা খুলে বন্দুকধারী লোকজন আমাদের উপর ব্রাশফায়ার চালিয়ে মেরেও ফেলতে পারে এবং এ ধরনের মৃত্যু ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীনের পরে অত্যন্ত অপমানকর মৃত্যু হবে মনে করে আমরা সবাই ক্ষোভ প্রকাশ করছিলাম, মেজর জলিল বদ্ধ রুমের একটা সোফাতে বসে খাঁচায় বন্দী সিংহের মতো ফুঁসছিলেন। তখন বেলা ক'টা হবে খেয়াল নেই, জিজ্ঞেস করতে একজন বলল মনে হয় বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। সকালে খুলনা থেকে আসার সময় তড়িঘড়ি করে সবাই নাশতা করে এসেছিলাম, কিন্তু সবাই আমার মতো মনে হলো ক্ষুধা ও পানির তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ দরজাটা খুলে ঘন শীতে কুয়াশা কাটা রোদের পর এক ঝলক উজ্জ্বল আলো কক্ষটিকে প্রবেশ করায় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম কর্নেল মঞ্জুর তার পিছনে থাকা ৮নং সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এন হুদা ('৭৫-এর সিপাহী জনতার বিপ্লবের কালে নিহত) এ ছাড়া আমাদের বন্দীকারী দাঁড়িওয়ালা পাতলা যুবকটিকে অস্ত্রসহ

দাঁড়ানো দেখলাম। হঠাৎ মনে হলো খুলনা সার্কিট হাউজের কর্নেল মঞ্জুরের আমাকে বলা শেষ কথাটা যে 'I will see him and will teach him a good lesson'। বুঝে গেলাম আমরা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পরই জেনারেল ওসমানীর সহায়তায় কর্নেল মঞ্জুর আমাদের বিরুদ্ধে শাণিত ষড়যন্ত্রের অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। কর্নেল মঞ্জুরকে দেখে মেজর জলিল হুঙ্কার দিয়ে দরজার কাছে এসে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জে উঠে বললেন 'What is this Monjur, why you have done it, under whose order you have done it' কর্নেল মঞ্জুর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন ' It has been done under the command of General Osmany' এরপর দু'জনের মধ্যে আর্মি ভাষার ইংরেজিতে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় এবং কিছু গালাগালি হলো। এ অবস্থায় আমরাও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম এবং সমস্বরে কর্নেল মঞ্জুরকে তার এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে দায়ী করে গালাগাল দিতে লাগলাম। কর্নেল মঞ্জুরের সাথে থাকা তার অফিসারদের কক্ষের দরজাটা তালা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিয়ে দ্রুত সরে পড়লেন। এই আকস্মিক ঘটনার পর আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম এবং আমাদের ভাগ্যে এরপর কি ঘটতে পারে তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে থাকলাম। এভাবে ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। ডিসেম্বরের শেষ শীতের আবহাওয়া কিন্তু বন্ধ কক্ষটির মধ্যে আমরা ঘেমে উঠতে লাগলাম। সবাই ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর বেশ কয়েকজন সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত অফিারসহ সেনা সদস্য এসে দরজা খুলে অস্ত্রের মুখে মেজর জলিলকে ঐ কক্ষে রেখে আমাদেরকে সার্কিট হাউসের আরেকটি বড় কক্ষে জোর করে ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করল, দরজার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখলাম তাতে অনুভব করলাম যশোর সার্কিট হাউসকে একটা জেলখানার মতো করে চারদিকে মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র সেনা সদস্যরা অবস্থান নিয়ে তাদের অস্ত্র আমাদের দিকে তাক করা। বেলা তখন ৩টা, ক্ষুধা, ও তৃষ্ণায় এবং উত্তেজনায় আমরা কাতর। অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটছে। মেজর জলিলকে নিয়ে আমরা সবাই তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, তাকে ওরা কি অবস্থায় রেখেছে এবং তার অবস্থা কি হবে এই নিয়ে ভাবছি। ৮নং সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর হুদার বাড়ি বরিশালে। আমরা বিশেষ করে আমি তার ও তার পরিবারের সাথে পরিচিত ছিলাম। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে তিনি সাথে দু'জন অফিসার নিয়ে আমাদের কক্ষের তালা খুলে প্রবেশ করলেন এবং

তিনি আমাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন এই বলে যে, আমাদের বিরুদ্ধে এই সাময়িক আটক ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু মেজর জলিলের বিরুদ্ধে সেনা বিধি অনুযায়ী হাইকমান্ডের নির্দেশ অমান্য, বিদ্রোহ এবং খুলনা শহরের পতনের পর লুটতরাজ পরিচালনার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তার বিভিন্ন বিরোধী বক্তব্য ও পদক্ষেপের জন্য তাকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা হতে পারে বলে জানালেন। তিনি সাথে করে নিজের বাসা থেকে বড় দুটো গামলা করে পোলাও মাংস এনে আমাদের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং সহমর্মিতার ভাব দেখাতে লাগলেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কথোপকথন চলার পরে তিনি যখন মেজর জলিলের নিরাপদ অবস্থানের ব্যাপারে আমাদের আশ্বস্ত করলেন এবং সকাল থেকে ঘটা সকল ঘটনার জন্য তার অসহায়তার কথা জানালেন তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম খাওয়াদাওয়া করার এবং মেজর হুদার আনীত খাবার সকলে খেলাম। হুদা চলে যেতেই আমাদের কক্ষের দরজা বাইরে থেকে পূর্বের ন্যায় আবার তালাবদ্ধ হলো এভাবেই অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, হঠাৎ বন্ধ দরজা আবার খুলল, আমাদেরকে এক অফিসার এসে জানালেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে আমাদের সাথে আনা বাক্স-পেটরার, সিজার লিস্ট তৈরি করে সিজ করার জন্য। আমাদের একে একে সেনা সদস্যদের প্রহরায় যশোর সার্কিট হাউসের বড় ড্রয়িং রুমে আনা হলো। সেখানে এসে দেখি আমাদের ব্যাগ ব্যাগেজগুলো একত্রিত করা। তার মধ্যে মেজর জলিলের ব্যাগটিও ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু ধর্মীয়। তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথা আমাদেরকে জানিয়ে প্রত্যেকের ব্যাগ, বাক্স এক এক করে খুলিয়ে ভিতরকার মালামাল জব্দ তালিকা তৈরি করতে লাগলেন। রাগে ও ক্ষোভে আমি ক্যাপ্টেন সুলতান, ডা. শাজাহান, লে. আহসানুল্লাহ সোফায় বসে রইলাম। অন্যরা একে একে তাদের ব্যাগ বাক্স খুলে ম্যাজিস্ট্রেটকে জব্দ তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করতে লাগল। এরপরে আমাদের পালা আমাদের ব্যাগ বাক্সগুলোর একই প্রক্রিয়ায় খোলা ও একই কায়দায় জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো। সর্বশেষে মেজর জলিলের ব্যাগটা যখন খোলার জন্য বলা হলো আমরা তাতে অস্বীকৃতি জানালাম, আমাদের দাবি যে ঐ ব্যাগের চাবি মেজর জলিলের কাছে এবং তিনি ছাড়া ঐ ব্যাগ আমরা খুলিতে পারব না। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মেজর জলিলের সর্বশেষ অবস্থা ও অবস্থান জানা। পরে মেজর জলিলের ব্যাগ খোলার চাবি না পাওয়ায়

ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং ব্যাগটির ওজন নিরূপন করে বলতে লাগলেন যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যাগভর্তি খুলনা থেকে লুট করা সোনাদানায় ভর্তি। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে উপস্থিত সেনা সদস্যদের একজন ব্যাগের তালা ভাঙলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটসহ সবাই হুমড়ি খেয়ে ব্যাগটা খোলার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। ব্যাগটা খোলা হলো, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো কিছু কাগজপত্র এবং গেরিলা যুদ্ধের উপর বিশ্বের বিভিন্ন গেরিলা কমান্ডারদের লেখা বিদেশে মুদ্রিত মোটামোটা বই। বইগুলো আমি এবং মেজর জলিল যখন কলিকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের হেডকোয়ার্টারে যেতাম তখন ফেরার পথে বিভিন্ন বুক স্টল থেকে মেজর জলিল এগুলো কিনেছিলেন। আমাদের মধ্যে দায়িত্ববান অফিসার মনে করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে ডেকে ড্রয়িং রুমের এক কোনায় নিয়ে বসলেন এবং বললেন, "আমাকে বলা হয়েছিল, মেজর জলিল তার সঙ্গীয় বাহিনী খুলনা শহর থেকে লুট করে আনা ব্যাগ ও বাক্স ভর্তি স্বর্ণালঙ্কারসহ টাকা পয়সা নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন তাই আপনাদেরকে আটক করে ঐ অভিযোগের সমর্থনে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এই জব্দ তালিকা করতে আসা।" তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে আমাকে বললেন যে আপনাদের প্রত্যেকের ব্যাগ-বাক্সে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের এমুনেশন ছাড়া আর কিছু তো পেলাম না। তার কথায় মনে হলো তিনিও একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন আমাদের এই গ্রেফতারে। জব্দ তালিকা নাটকের পর্ব শেষ হবার পর্যায়ে তখন রাত ৮টা কি ৯টা বাজে, হঠাৎ দেখলাম একটা জিপসহ কয়েকটি সেনাবাহিনীর গাড়ি সার্কিট হাউস চত্বরে ঢুকল। আমাদের সাথে থাকা বিচ্চু আলম কোন্ ফাঁকে ড্রয়িংরুম থেকে পালিয়ে বেরিয়ে মেজর জলিলকে যে রুমে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তার কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে লুকোল। উদ্দেশ্য মেজর জলিলের অবস্থান ও অবস্থা জানা, পরে সে ধৃত হয়ে আমাদের রুমে যখন আসল ওর কাছে জানতে পারলাম মেজর জলিলকে ঐ প্রবেশকারী জীপে কড়া প্রহরায় সেনাবাহী গাড়িসহ সার্কিট হাউজ থেকে নিয়ে গিয়েছে। পরে খবর পেলাম তাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে একটি কক্ষে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে। পরের দিন খুলনা থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের লেখা যশোর সার্কিট হাউসে পাহারারত এক মুক্তিযোদ্ধার হাত দিয়ে একটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা ছিল ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার মেজর জয়নুল আবেদীন তার কিছু অনুগত বাহিনী নিয়ে করায়ত্ত হয়েছে। ক্যাপ্টেন হুদা যাকে মেজর জলিল খুলনা ত্যাগের

আগে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন তাকে ও ৯নং সেক্টরের সেক্টর হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত হেডকোয়ার্টার ফোর্সের সকলকে রূপসা নদীর তীরে একটা দালানে নিরস্ত্র করে নজরবন্দী রাখা হয়েছে এবং খুলনার সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাস-ট্রাকে করে যশোর সার্কিট হাউস দখল করে মেজর জলিলসহ আমাদের মুক্ত করার জন্য আমাদের নির্দেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত। চিরকুটের মর্ম বুঝে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম খুলনার মুক্তিযোদ্ধারা যশোরের দিকে এগোলে তাদের সাথে কর্নেল মঞ্জুরের বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এই ধরনের আত্মকলহ ও রক্ত ঝরাঝরি, মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই একটা চিরকুটের মাধ্যমে যশোরে আমাদের সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে খুলনার মুক্তিযোদ্ধাদের শান্ত থাকার জন্য আমার জবানীতে পূর্বের কায়দায় চিরকুটটা পাঠালাম। আমাদের প্রতিদিন খাবার সময়, তালা খুলে খাবার দেয়া হতো, খাওয়া শেষে আবার দরজায় তালা পড়ত। আমাদের একজনের কাছে বোধ হয় নারায়ণগঞ্জের বাচ্চুর কাছে একটা ছোট রেডিও ছিল, সেই রেডিওতে বাংলাদেশ বেতারের খবর শুনতাম। পরের দিনই খবরে জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে পাঠিয়েছে তিনি সেখান থেকে দিল্লী হয়ে শিঘ্রই ঢাকা ফিরবেন। স্বাধীন বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর এই প্রত্যাবর্তনের খবর আমরা বন্দী অবস্থায় পেলাম। এটা যেন আমাদের জন্য কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো লাগলো। পরের দিন রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের ধারাভাষ্য বেতার বাংলাদেশ থেকে যখন দেয়া হচ্ছিল তখন ঢাকা বিমানবন্দরে উপস্থিত জেনারেল ওসমানীসহ সব সেক্টর কমান্ডারদের নাম বলা হচ্ছিল এর কিছুক্ষণের মধ্যে ধারাভাষ্যে শুনতে পেলাম দিল্লী থেকে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে। তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে এসেছেন সবার সাথে কোলাকুলি ও করমর্দন করছেন। চারদিকে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের আনন্দে লাখ লাখ লোকের উল্লাস ধ্বনি শুনছিলাম ধারাভাষ্যে। মনের অজান্তে সকলের চোখ বেয়ে তখন দর দর করে পানি পড়ছিল। মনে হলো দীর্ঘ ৯ মাস আমরা ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা যে ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে ৯নং সেক্টর এলাকায় মরণপণ যুদ্ধ করেছিলাম তারই প্রতিদান পেলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বন্দী হিসেবে যশোর সার্কিট হাউজের তালাবদ্ধ কক্ষে বসে, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের

ধারাভাষ্য শোনার মধ্য দিয়ে। এভাবে কোথা দিয়ে ১৭ দিন কেটে গেল। একদিন বিকেলে কর্নেল মঞ্জুর গাড়ি পাঠালেন আমাকে নিয়ে যেতে ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে (তৎকালীন ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার)। হঠাৎ এই ধরনের ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করল। আমাকে এসকর্ট করে তিন চারজন মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল মঞ্জুরের দফতরে নিয়ে গেল। সেখানে গাড়ি পৌঁছিয়ে আমাকে যখন মঞ্জুরের অফিসকক্ষের সামনে নেয়া হলো তখন মঞ্জুর হাসিমুখে বেরিয়ে এসে আমার সাথে করমর্দন করে আমাকে তার কক্ষে ঢোকালেন, চেয়ারে বসতে বললেন, তারপর জানালেন সার্কিট হাউজে আমরা যারা আছি, সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কর্নেল মঞ্জুর আমাকে ৮নং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে লিখিতভাবে ২ সপ্তাহের ছুটি দিয়ে ছুটির পত্রটি সই করে আমার হাতে দিয়ে বললেন 'Come back again after completion of your leave and join with me as captain and I need a good officer like you' মনে মনে কর্নেল মঞ্জুরের ব্যবহারসহ যুদ্ধপরবর্তী মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অমানবিক আচরণ এবং তৎপরবর্তী বন্দীজীবনান্তে মনে মনে সিদ্ধান্ত এসে গেল যে ফিরে যাব আমার ফেলে আসা জীবনে এবং থাকব যেভাবে থাকতে পারি, তবে আর নয় এদের অধীনে থেকে কোন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জীবনযাপন। এসব ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম মঞ্জুরের সম্মুখে। মেজর জলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাকে ঢাকা রেসকোর্সে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানালেন কর্নেল মঞ্জুর। কথা বলতে বলতে চা এলো। তিনি খেতে অনুরোধ করায় মনের অনিচ্ছায় কাপে চুমুক দিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ বিস্বাদ লাগল মঞ্জুরের দেয়া চা। ঐ রাতেই আমাদের যশোর থেকে গাড়ি করে খুলনায় ক্যাপ্টেন হুদার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং সেখানে এসে শুনলাম সবাইকেই একই কায়দায় ছুটি দিয়ে যার যার বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলো। ১৭ ডিসেম্বর আমরা যখন বীরদর্পে পাকবাহিনীকে পরাস্ত করে খুলনা শহরে প্রবেশ করেছিলাম এবং আট হাজার পাকবাহিনীর সদস্য যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তখন বুঝিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে একটি মহল এ রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতবিক্ষত করে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলবে।

সমাপ্তি পর্ব

৯নং সেক্টর মুক্তিযুদ্ধকালে একটি সংগঠিত গেরিলা যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এবং পরিচালিত হয়। অন্যান্য সেক্টরের মতো এ সেক্টরে কোন সুশৃঙ্খল রেজিমেন্টেড বাহিনী ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল যেসব সেনাবাহিনীর অফিসার ও সদস্য, পুলিশ, তৎকালীন ইপিআর ও আনসারসহ ছাত্র জনতা কৃষক শ্রমিকদের সমন্বয়ে সমগ্র ৯নং সেক্টর এলাকাভুক্ত অঞ্চলে একটা গণবাহিনী তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যারা ৯নং সেক্টর এলাকায় অসমসাহসিকতা নিয়ে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। তৎকালীন রাজনৈতিক মত ও পথের গুরুত্ব না দিয়ে দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে যারা প্রস্তুত ছিল তাদের নিয়েই ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে সব সাব সেক্টর কমান্ডার ও সেক্টর হেড কোয়ার্টারের কর্মীদের সহায়তায় তৎকালীন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন মেজর জলিল। কোন লোভ-লালসার বশবর্তী হতে তাকে কখনও দেখিনি।

আমার এ লেখা খুব একটা তথ্যনির্ভর না হলেও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টরের সামগ্রিক ভূমিকা কতটুকু ছিল সেটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। ৯নং সেক্টর পরিচালনাকারী একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার স্মৃতিপটে যতটুকু ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতি বিদ্যমান সেইটুকুই। অসমসাহসী শত শত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী আমার ব্যর্থতার কারণে এ লেখনীতে আনতে পারিনি বলে ঐ সব জীবন উৎসর্গকারী বীরযোদ্ধার আত্মার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

মুক্তিযুদ্ধে ৯নং সেক্টরের উল্লিখিত বীরযোদ্ধাদের যুদ্ধ ও সাফল্যের কৃতিত্ব কারও একার নয়। এটা ছিল সম্মিলিতভাবে ৯নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা আপোসহীন কার্যক্রম যা সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় এবং অক্লান্ত অকুতোভয় পরিশ্রমে পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করলেও সেই আমার কোন মুক্তিযোদ্ধার সনদ বা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। আমার এ অপ্রাপ্তির কথা এ কারণেই উল্লেখ করলাম যে ৯নং সেক্টরের বহু নিরলস কর্মী ও যোদ্ধারা আমার মতো একই অবস্থানে আছি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যেভাবে বিভিন্ন অবস্থানে থেকে দেশের বাইরে গিয়ে, বিদেশে অবস্থান করে অথবা শত্রুকবলিত দেশের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করেছে এমনকি সার্বিক সমর্থন দিয়েছে তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীনের ৩৬ বছরের প্রান্তে আমি ৫৮'র কোঠার দিকে এগোচ্ছি আর হিসেব করে দেখছি যে, ১৫/২০ বছর পরে বাংলাদেশের মাটিতে আর কোন মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে থাকবে না। আর যারাও এরপর থাকবেন তারা বয়োবৃদ্ধ অচল বাকশক্তিহীন এবং বয়োভারে বৃদ্ধ, জাতির এক বোঝা হিসেবে তাদের যার যার অঙ্গনে বর্তমান অবস্থার ন্যায় অবহেলিত থেকে যাবেন।

নতুন প্রজন্ম হয়তো গর্ব করবে স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সোনার বাংলাকে নিয়ে। কিন্তু তখন যেসব কারিগর এই স্বাধীন বাংলার লাল-সবুজের ইমারত গড়েছিল তাদের মনে করার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন হবে না তাদের গড়া লাল-সবুজের পতাকার দেশকে স্বাধীনকারী যোদ্ধাদের নিয়ে কোন কাহিনী বলার, সোনার, অনুভব এবং মূল্যায়ন করার। প্রকৃতিগতভাবে সন্তান যেভাবে তার বাবার উত্তরাধিকারী হয় যে বাবা ছিল তার দাদার উত্তরাধীকারী সেভাবেই মনে করবে এদেশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা। এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। যা হোক এই বিপ্লবের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে যা কিছু করেছি সেটা সময়ের প্রয়োজনে সত্য ছিল বলেই বিশ্বাস করে এ লেখনীর সমাপ্তি টানছি।

পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে দ্বিতীয় পর্ব–

নবম সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধকালীন আলোকচিত্র

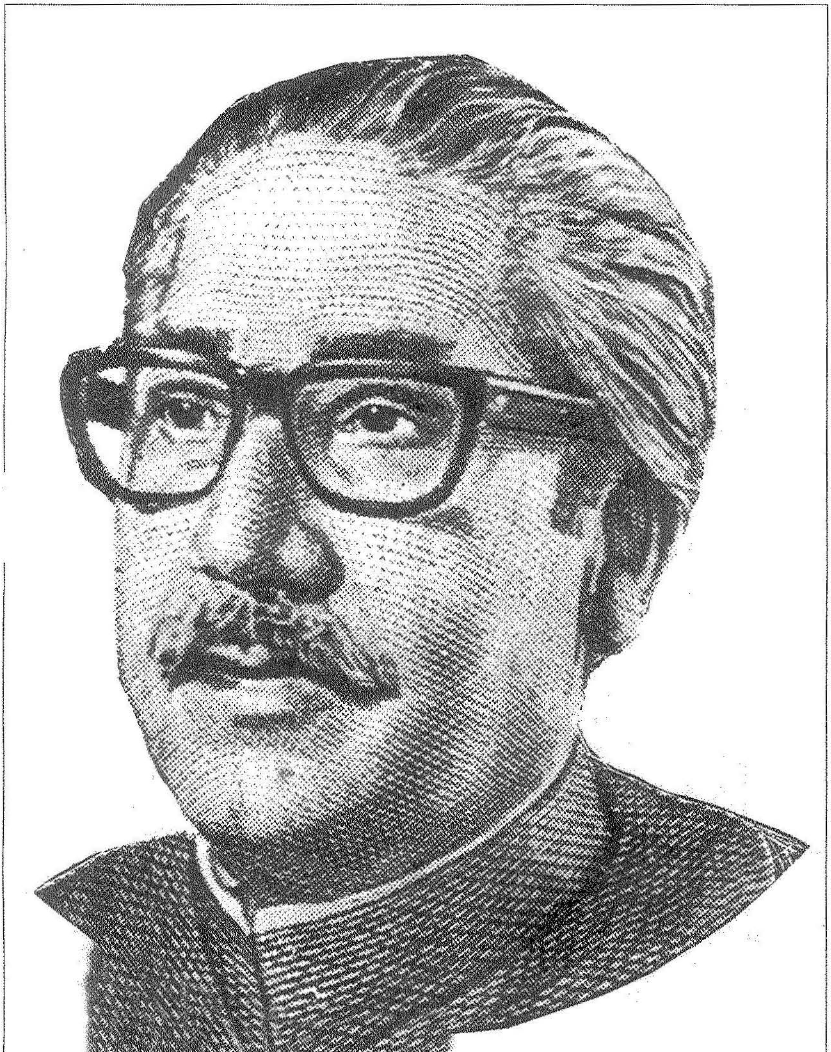

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক
জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

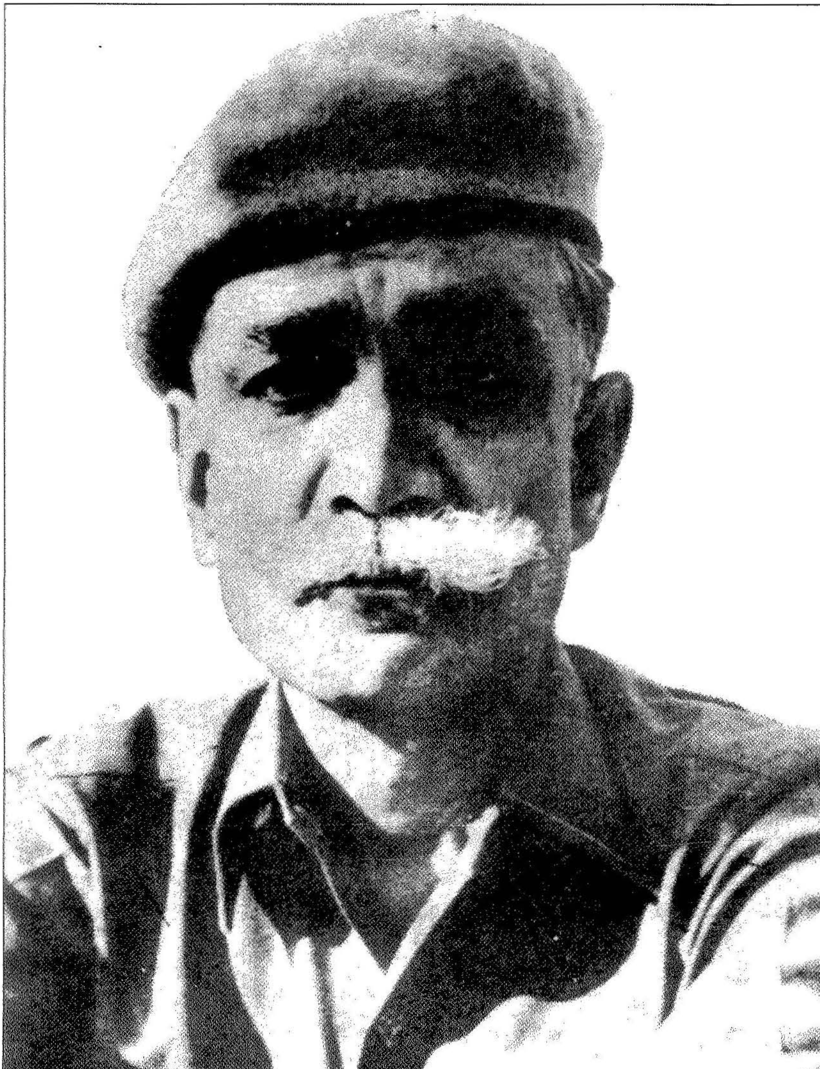

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি
জেনারেল এম আতাউল গণি ওসমানী

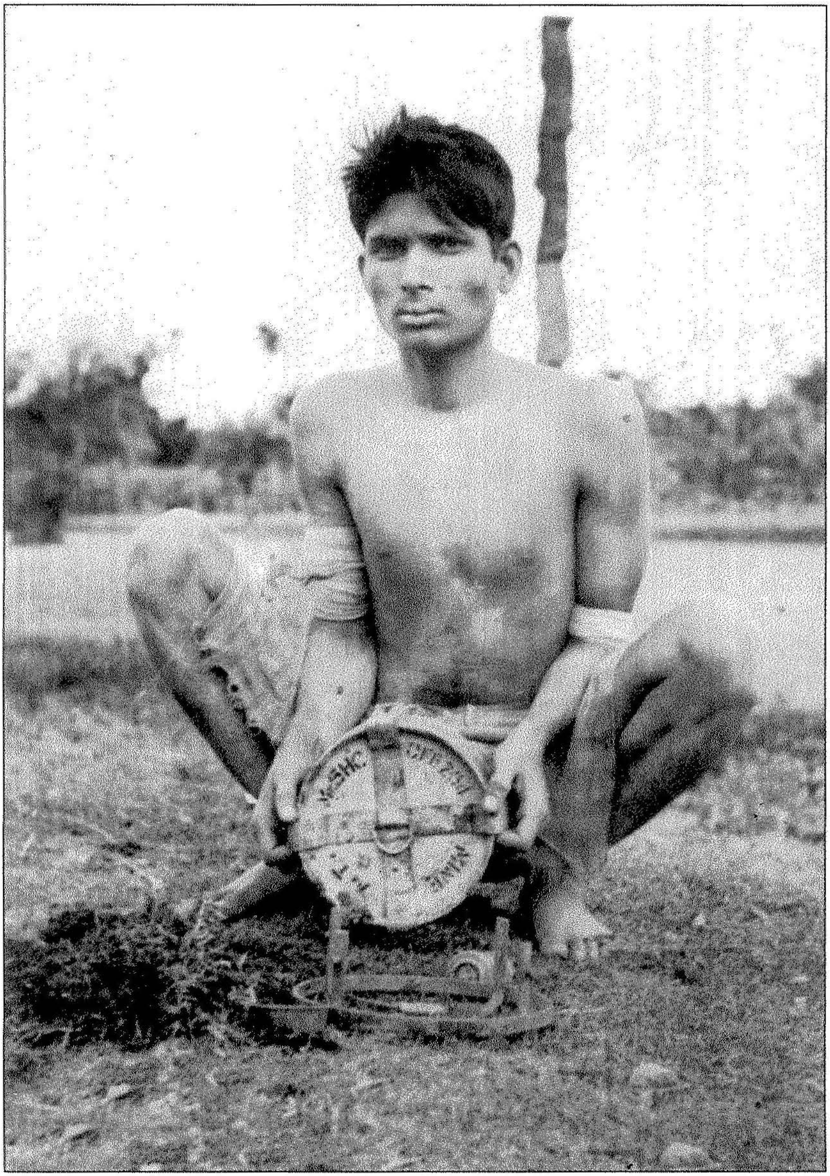

পাক বাহিনী কতৃক সাতক্ষিরা থেকে প্রেরিত কমান্ডো ৯ নং সেক্টরের বেইজ ক্যাম্প বাকুড়িয়া যাওয়ার রাস্তার সেক্টর কমান্ডারকে গাড়ীসহ উড়িয়ে দেবার জন্য মাইন পোতার কালে মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে ধৃত মাইনসহ।

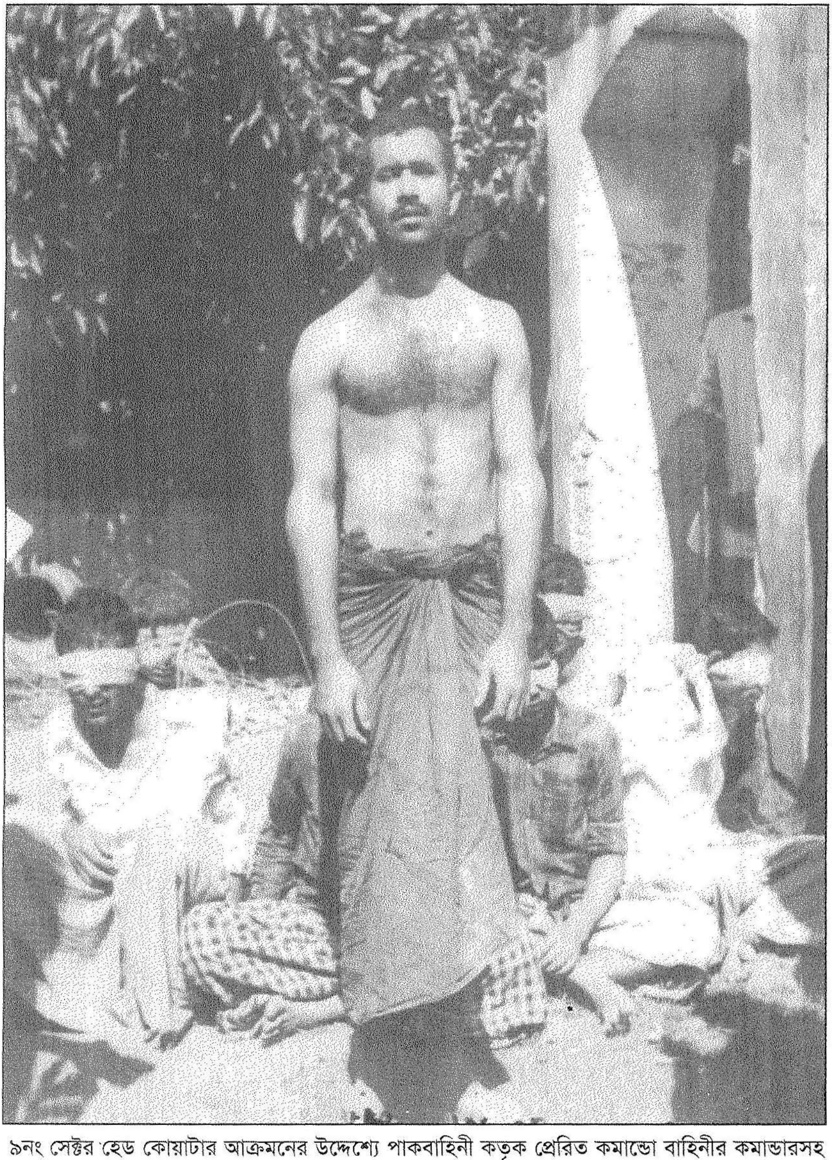

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটার আক্রমনের উদ্দেশ্যে পাকবাহিনী কতৃক প্রেরিত কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডারসহ পাক গেরিলাদের মুক্তি বাহিনী গ্রেফতার করে।

সাতক্ষিরার শ্যামনগর থানা দখলের জন্য ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে মুক্তি যোদ্ধারা একটি জলাসয় অতিক্রম করছেন

মুক্ত কালিগঞ্জ দেবহাটায় কর্নেল ওসমানী পরিদর্শনে এলে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল নৌবাহিনীর কমান্ডার আলম, ক্যাঃ খুরশিদ ডান দিকে ক্যাঃ ডঃ সাজাহান মেজর জলিলের দেহরক্ষী আকবর এবং সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদার সাথে আলাপরত

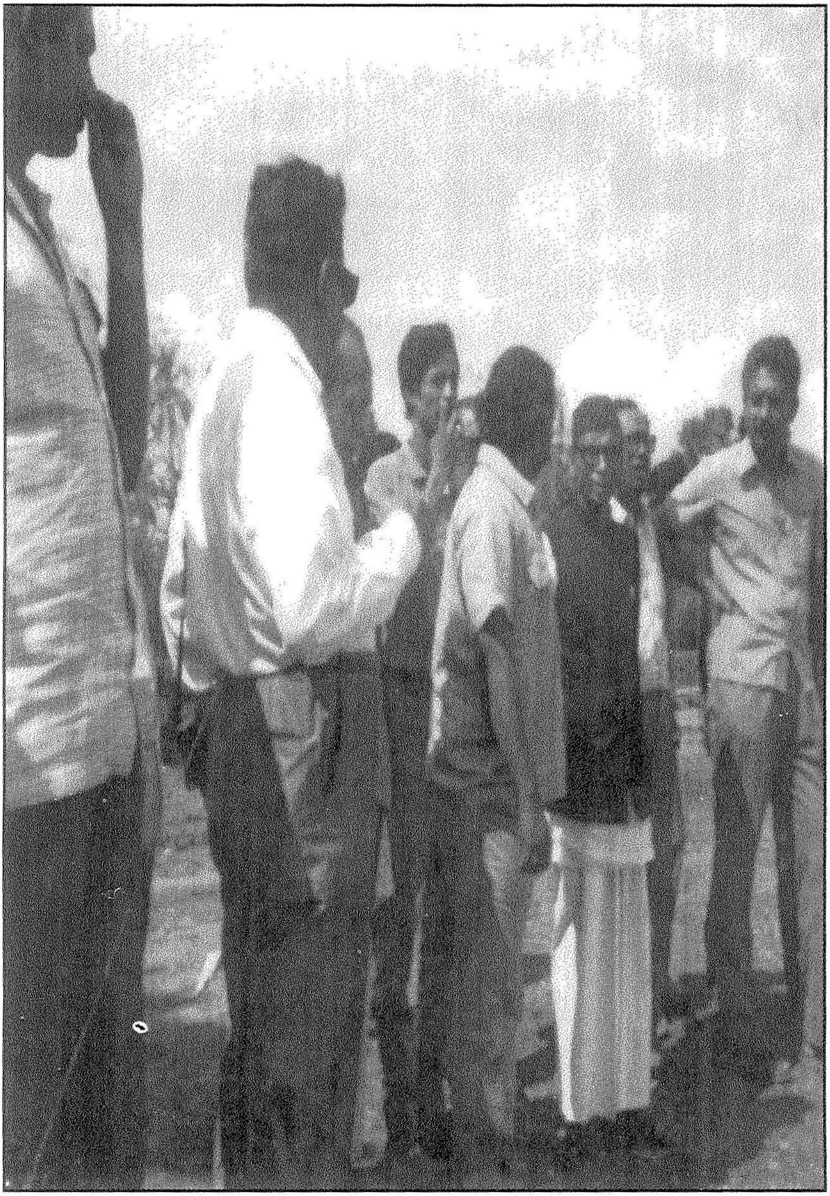

বাম থেকে লেখক, সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ নুরুল ইসলাম মঞ্জু এম.এন.এ ৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারের সম্মুখে

মুক্ত এলাকায় মুক্তি যোদ্ধাদের যুদ্ধ মহড়া পরিদর্শনে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (এম.এন.এ)

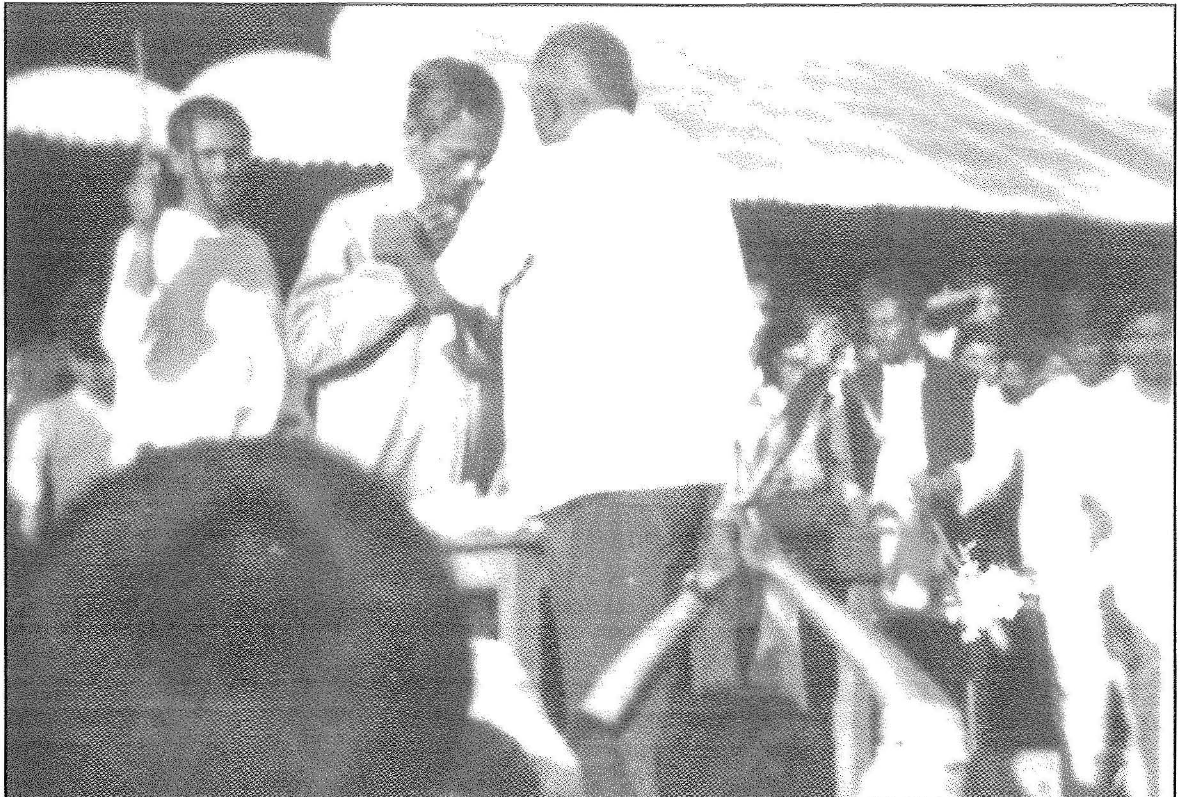

৯নং সেক্টর অন্তরভুক্ত গৌরনদী থানা মুক্ত হওয়ার পর দক্ষিণ পশ্চিম জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এম.এন.এ আব্দুর রব সেরনিয়াবাধকে গনসম্বর্ধনায় স্থানী জনগন

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ, নুরুল ইসলাম মঞ্জু
ও ফরিদ পুরের এম, এন, এ সামসুদ্দিন মোল্লা, সেক্টর হেডকোয়াটারের সম্মুখে

প্রধান সেনাপিতি কর্নেল ওসমানী মুক্ত দেবহাটা এলাকায় উপস্থিত মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষন দিচ্ছেন তার পিছনে কালো চশমা চোখে লেখক সোয়েটার পড়া আতিয়ার রহমান

ডান থেকে ক্যাপ্টেন সুলতানউদ্দিন, বাকুন্ডিয়া ইন্ডাকশন ক্যাম্প কমান্ডার মাঝে সেক্টর এডজুটেন্টন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক এবং সর্ব বামে ক্যাপ্টেন বেগ

প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী প্রাথমিক অবস্থায় তার এ.ডি.সি লেঃ নুর
স্বাধীন বাংলার প্রথম সামরিক অফিসার উত্তরনী প্যারেড গ্রাউন্ডে দন্ডায়মান

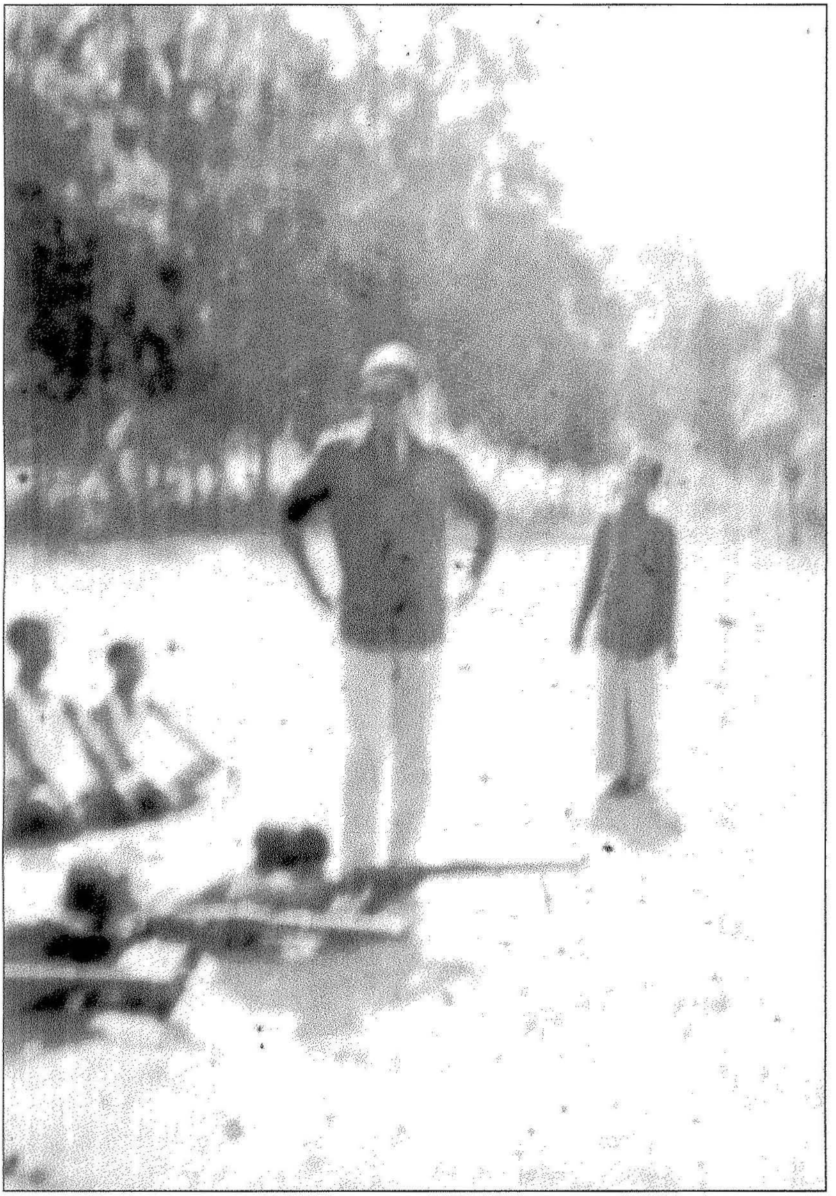

লেখক সদ্য মুক্ত দেবহাটা থানা এলাকায় স্থাপিত ট্রেনিং ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে মুক্তি যোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান করছেন

৯নং সেক্টরের মুক্ত এলাকায় তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্টপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদ সফরে আসেন তাঁদের সফরসঙ্গীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহন করছেন

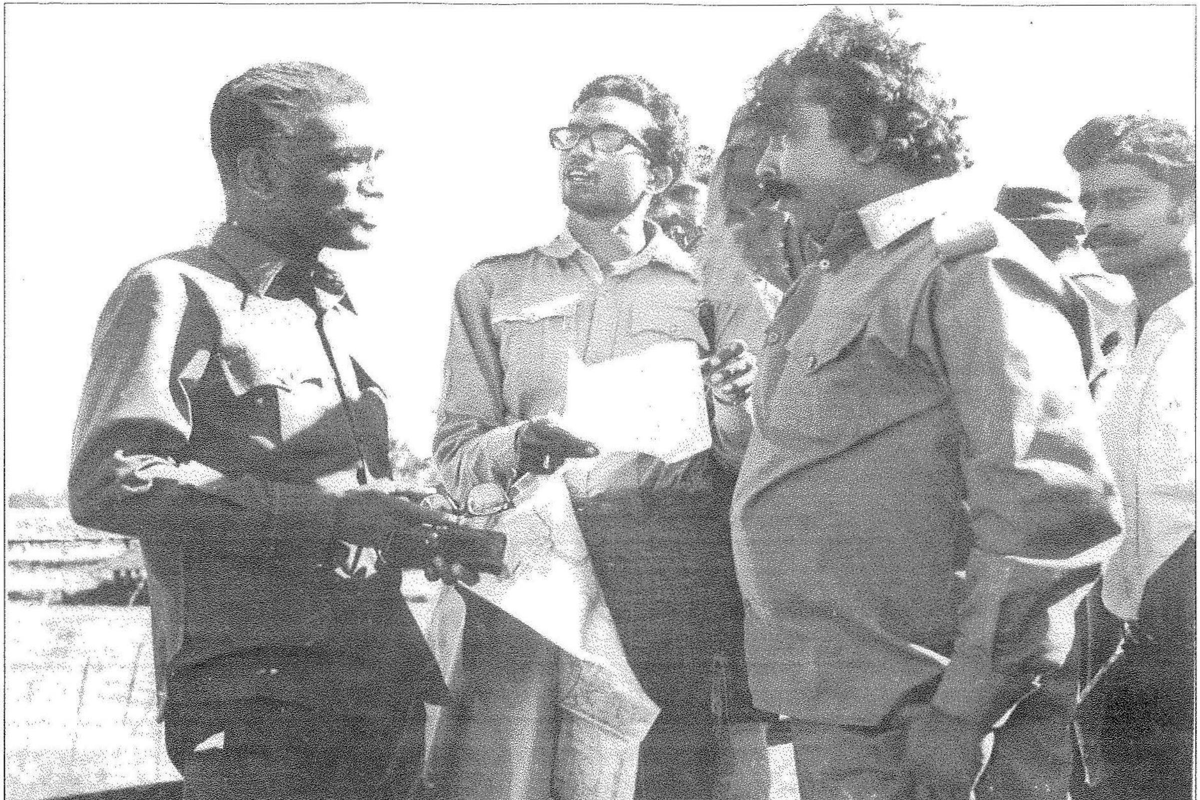

কালিগঞ্জ থানা থেকে সাতক্ষিরা রোডের পারুলিয়া ব্রিজ মুক্তি বাহিনীরা ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে উড়িয়ে দিয়ে দখল করার পর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী পরিদর্শনে আসেন এবং পরবর্তী যুদ্ধনীতি নিয়ে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ও সেক্টর সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টন হুদার সাথে আলাপরত

নুরুল ইসলাম মঞ্জু এম.এন.এ এবং লেঃ আহসানউল্লাহ্ মুক্তি যোদ্ধাদের সহায়তায় মর্টার হামলা চালাচ্ছে

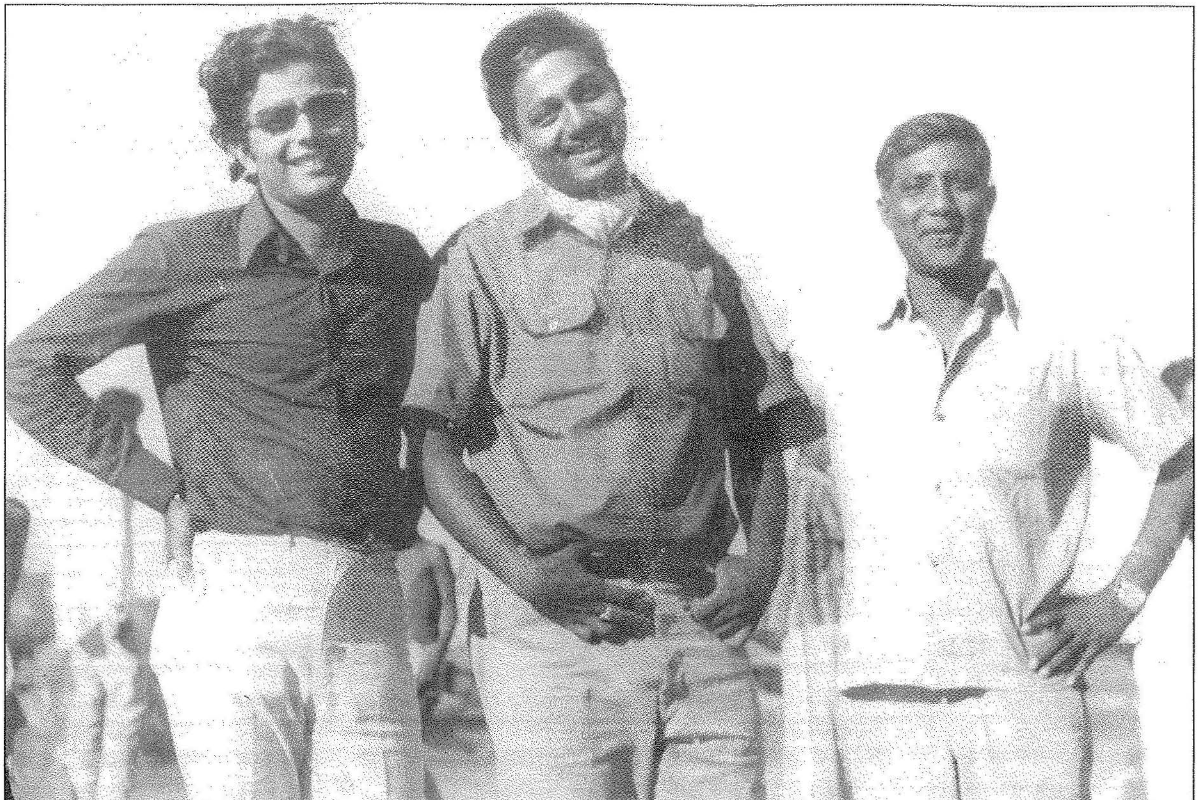

মুজিবনগর সরকারের তথ্য কর্মকতা আমিনুল হক বাদশা এবং নেভাল কমান্ডার আলমের মাঝখানে সেক্টর ষ্টাফ অফিসার লেখক

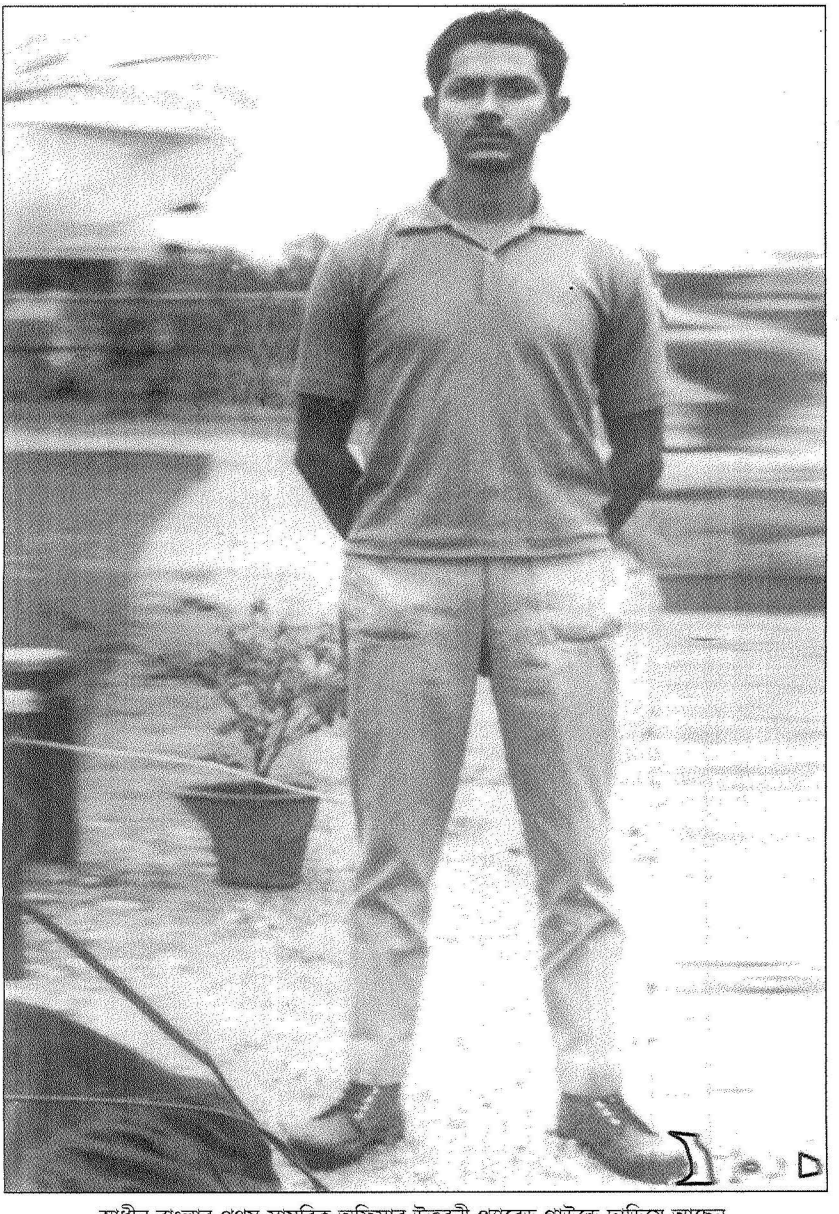

স্বাধীন বাংলার প্রথম সামরিক অফিসার উত্তরনী প্যারেড গ্রাউন্ডে দাড়িয়ে আছেন
উইং কমান্ডার এম কে বাশার (স্বাধীনতার পর বিমান বাহিনী প্রধান, প্রয়াত)

মুক্তি যুদ্ধকালীন প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর এডিসি লেঃ শেখ কামাল, সাতক্ষিরার দেবহাটা মুক্ত হওয়ার পর সম্ভর্ধনা সভায়

৯নং সেক্টরের হেড কোয়াটারের সম্মুক্ষে রেসন ও বেতন ভাতার দায়িত্বে লেঃ মফিজ

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারের কোয়ার্ডিনেশন অফিসার আগর তলা মামলার আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব

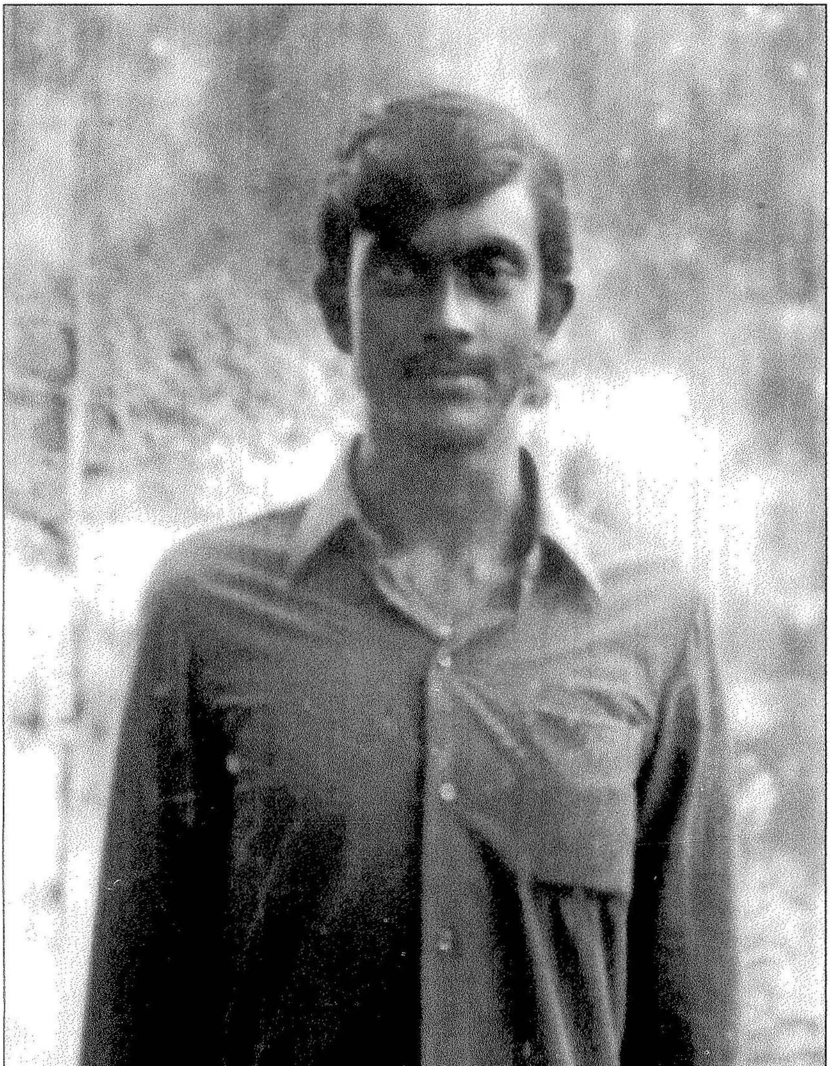

মুক্তি যুদ্ধ কালীন সময়ে সুন্দরবন বেইজ থেকে লেঃ জিয়াউদ্দিন (পরবর্তীতে মেজর)
৯নং সেক্টর হেডকোয়াটারে এলে, এ ছবিটি ধারন করা হয়।

ক্যাপ্টেন ডাঃ সাহজাহান (বর্তমানে অবঃ মেজর জেনারেল) সেক্টর মেডিকেল অফিসার

৯নং সেক্টরের বাকুন্ডিয়া ইভাকশন ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দীন

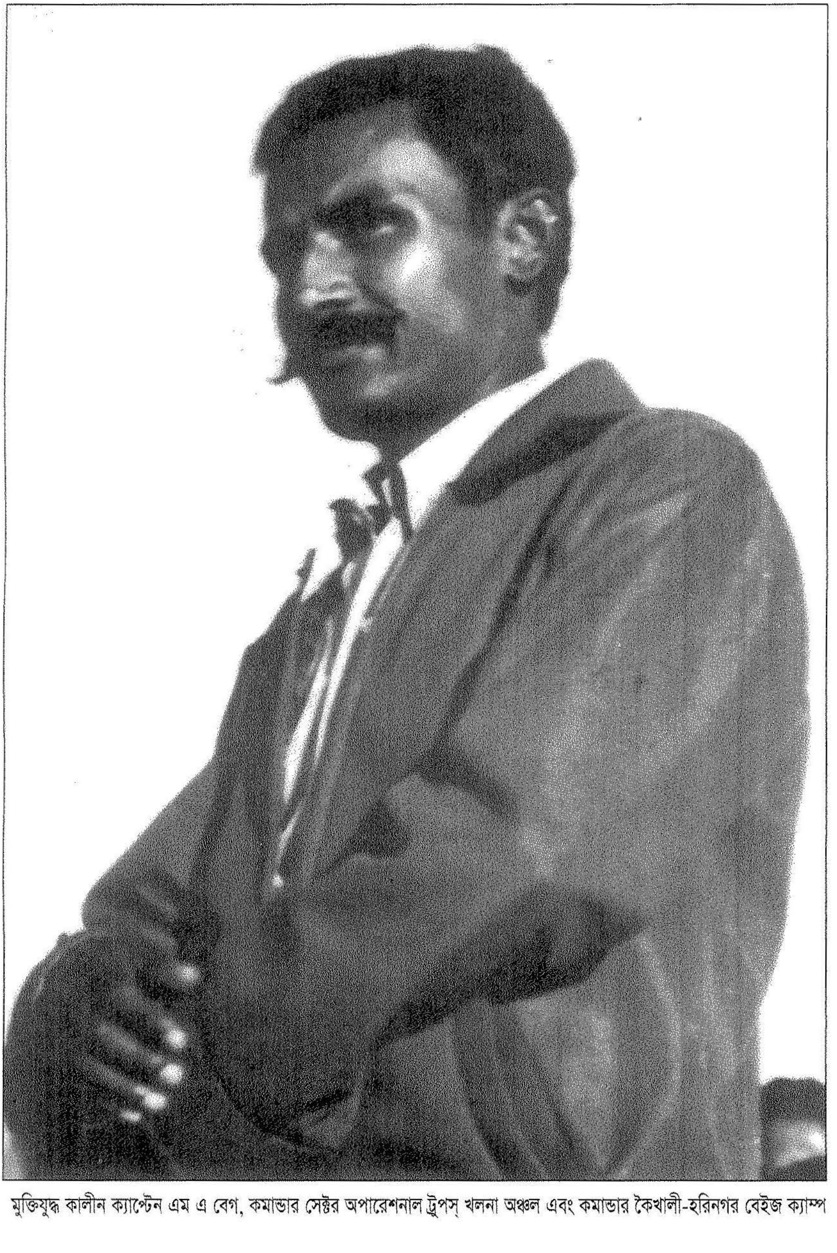

মুক্তিযুদ্ধ কালীন ক্যাপ্টেন এম এ বেগ, কমান্ডার সেক্টর অপারেশনাল ট্রুপস্ খলনা অঞ্চল এবং কমান্ডার কৈখালী-হরিনগর বেইজ ক্যাম্প

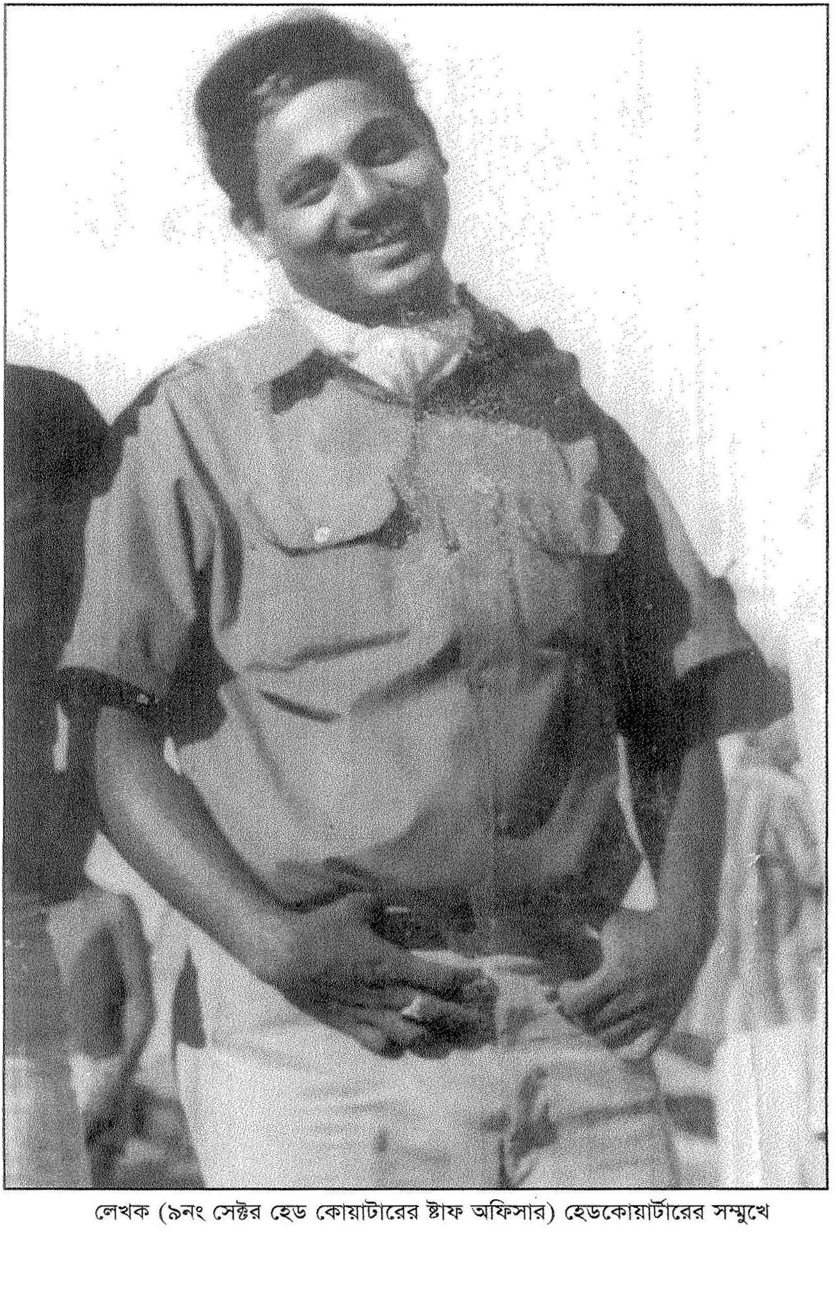

লেখক (৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারের ষ্টাফ অফিসার) হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে

৯নং সেক্টরের সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা (হিরু) মুক্ত এলাকায় আর্টিলারী যুদ্ধ পরিচালনা করছেন বাঙ্কারে বসে

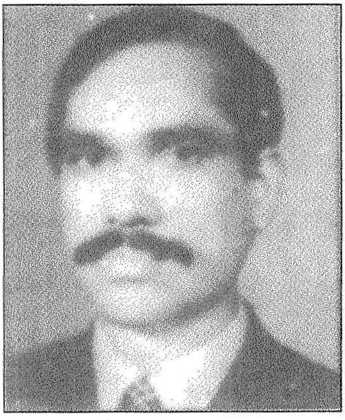

ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর
সাব-সেক্টর কমান্ডার বরিশাল অঞ্চল
(মেজর অবঃ)

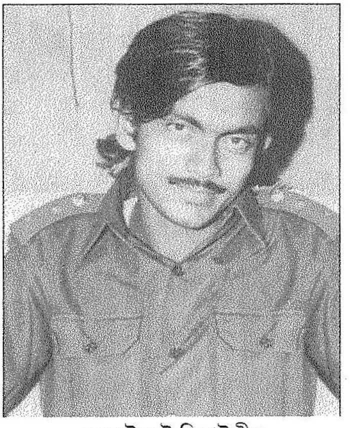

লেফটেনেন্ট জিয়াউদ্দীন
সাব-সেক্টর কমান্ডার, সুন্দরবন-পিরোজপুর-বাগেরহাট অঞ্চল
(মেজর অবঃ)

ক্যাপ্টেন মেহদী আলী ইমাম
সাব-সেক্টর কমান্ডার পটুয়াখালী অঞ্চল
(মেজর অবঃ)

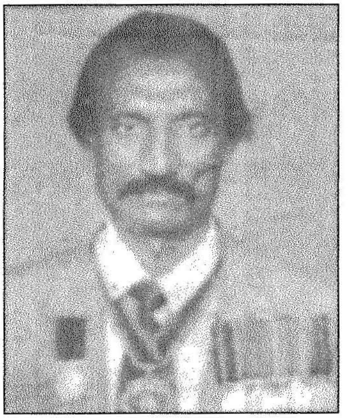

মুক্তিযুদ্ধকালীন
ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দীন (হেমায়েত বাহিনী প্রধান)
সাবসেক্টর কমান্ডার গোপালগঞ্জ-ফরিদপুর অঞ্চল

মুক্তিযুদ্ধকালীন
সেক্টর জয়েন্ট নেভাল কমান্ডার
মোহাম্মদ আলম

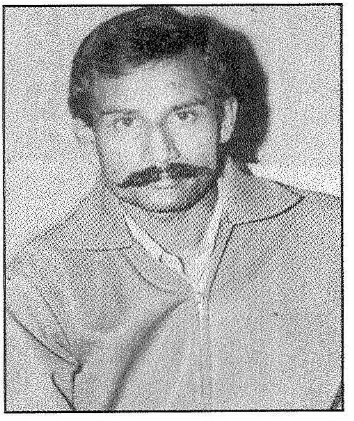

মুক্তিযুদ্ধকালীন
ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ
স্পেশাল বাহিনী প্রধান, খুলনা অঞ্চল

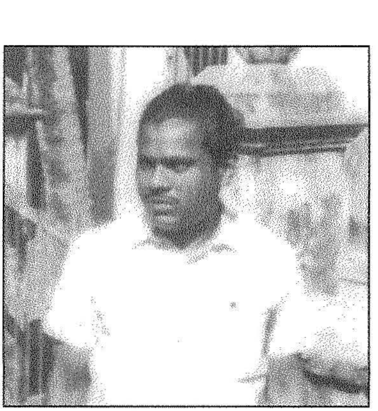

৯নং সেক্টর হেডকোয়াটার কো-অডিনেসন অফিসার ষ্টুয়ার্ড মুজিব
(আগর তলা মামলার নির্যাতিত অন্যতম আসামী - (প্রয়াত)

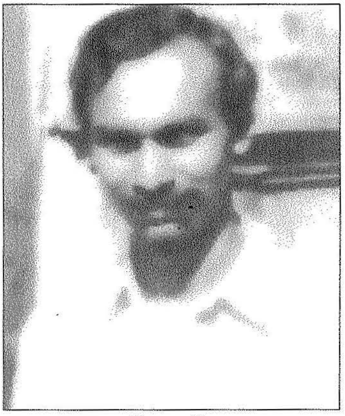

মুক্তিযুদ্ধকালীন
ক্যাপ্টেন ডাঃ সাহজাহান, সেক্টর মেডিকেল অফিসার

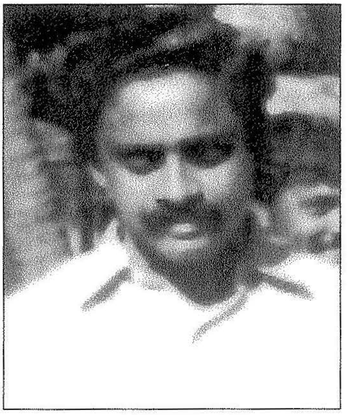

মুক্তিযুদ্ধকালীন লেফটেনেন্ট মফিজ
সেক্টর কোয়ার্টার মাষ্টার

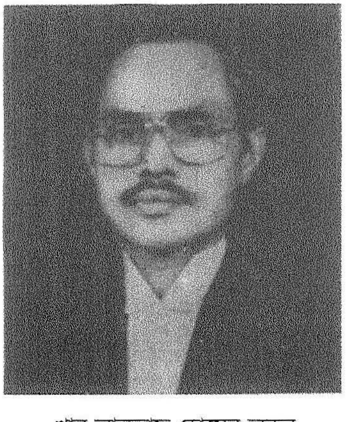

খান আলতাফ হোসেন অরুন
সেক্টর পলিটিকাল মটিভেটর

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন খুরশীদ
সেক্টর জয়েন্ট নেভাল কমান্ডার

সেক্টর সহ-অধিনায়ক (টোয়াইসি)
ক্যাপ্টেন নরুল হুদা

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন
লেখক - ৯নং সেক্টর হেডকোয়াটার ষ্টাফ অফিসার

ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক
সেক্টর এডজুটেন্ট

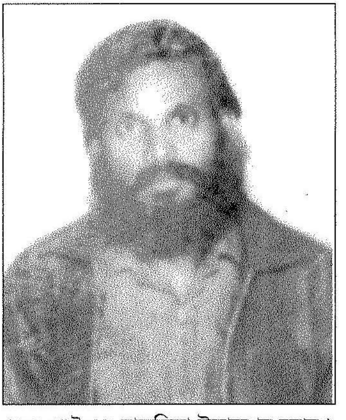

৯নং সেক্টরের বাকুন্ডিয়া ইন্ডাকশন ক্যাম্প
কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দীন

সেক্টর হেড কোয়াটারে সেক্টর কমান্ডারের অফিস কক্ষে মেজর জলিল

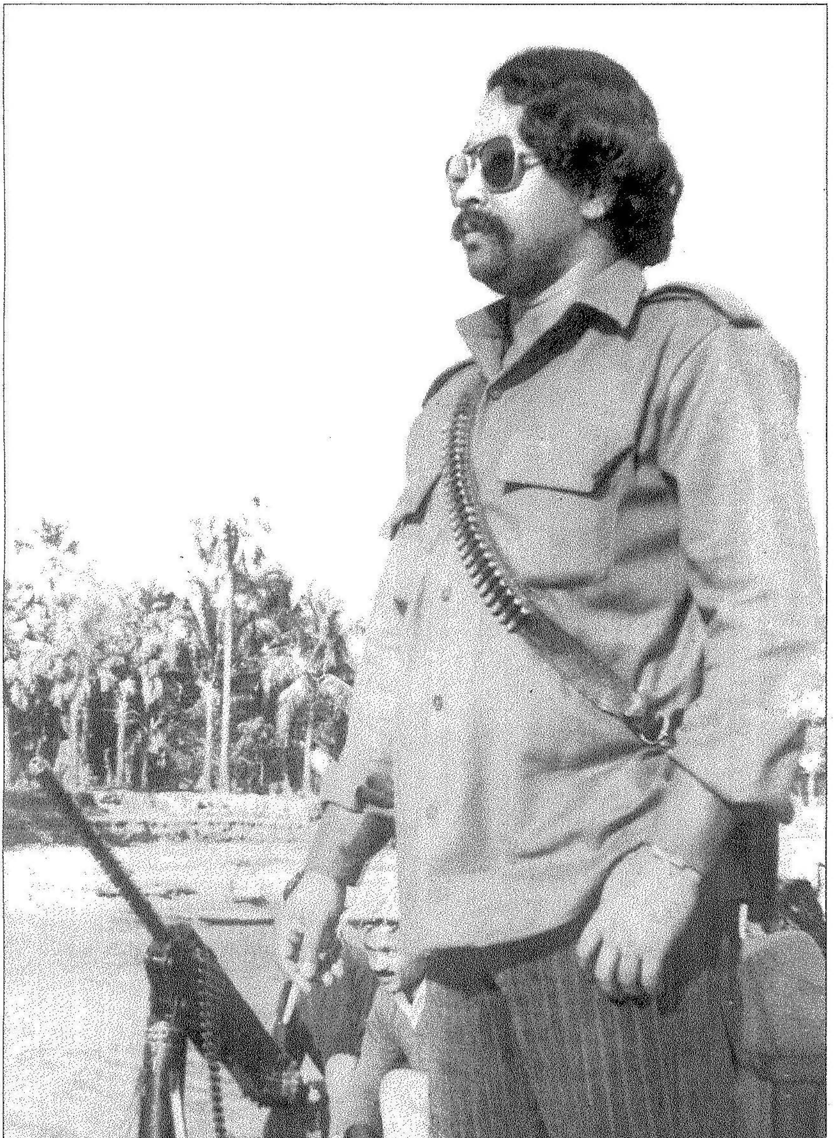

খুলনা পতনের পর মুক্তি যোদ্ধাদের ব্যবহৃত গানবোটে সুন্দর বন হয়ে বরিশাল যাচ্ছেন মেজর এম. এ জলিল

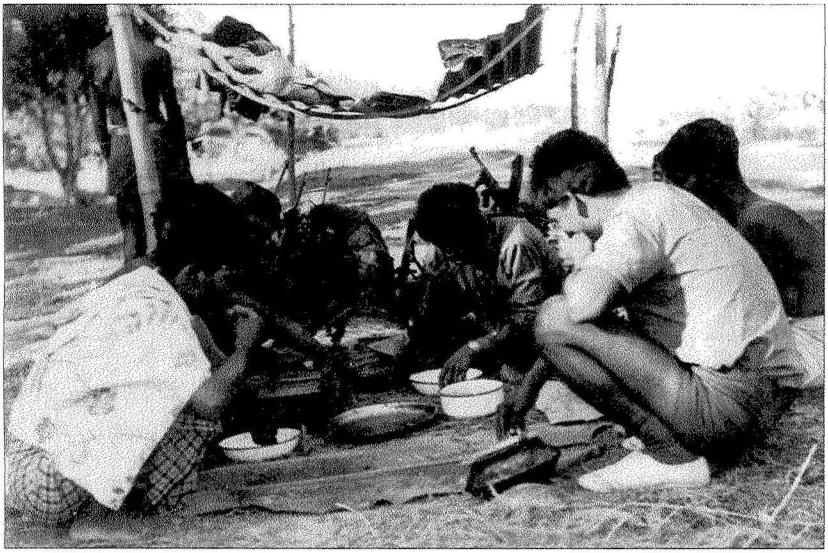

মুক্তি যোদ্ধারা সম্মুখ অবস্থানে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছেন

মুক্ত এলাকায় জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ চলছে

সাতক্ষিরার দেবহাটা থানা দখলের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী সফরে আসেন তার সাথে নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল, সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা, তাদেরকে স্থানীয় জনগণ সম্বর্ধনা প্রদান করছে।

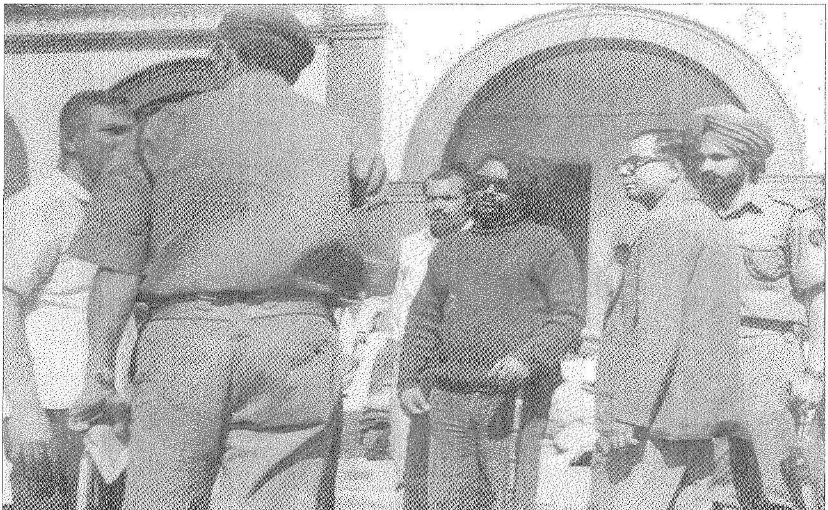

খুলনা দখলের পর সার্কিট হাউজের সম্মুখে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সহ ভারতীয় বাহিনীর অফিসারগন পাকসেনাদের আত্মসমর্পনের অনুষ্ঠান বিষয়ে আলাপ করছেন

সাতক্ষিরার কালিগঞ্জ থানা মুক্তি যোদ্ধাদের নিকট পতনের পর লেঃ আহছানউল্লাহ পাকসেনাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্র গননা ও পরীক্ষা করছেন

বাংলাদেশের মানচিত্রে নবম সেক্টর এলাকা

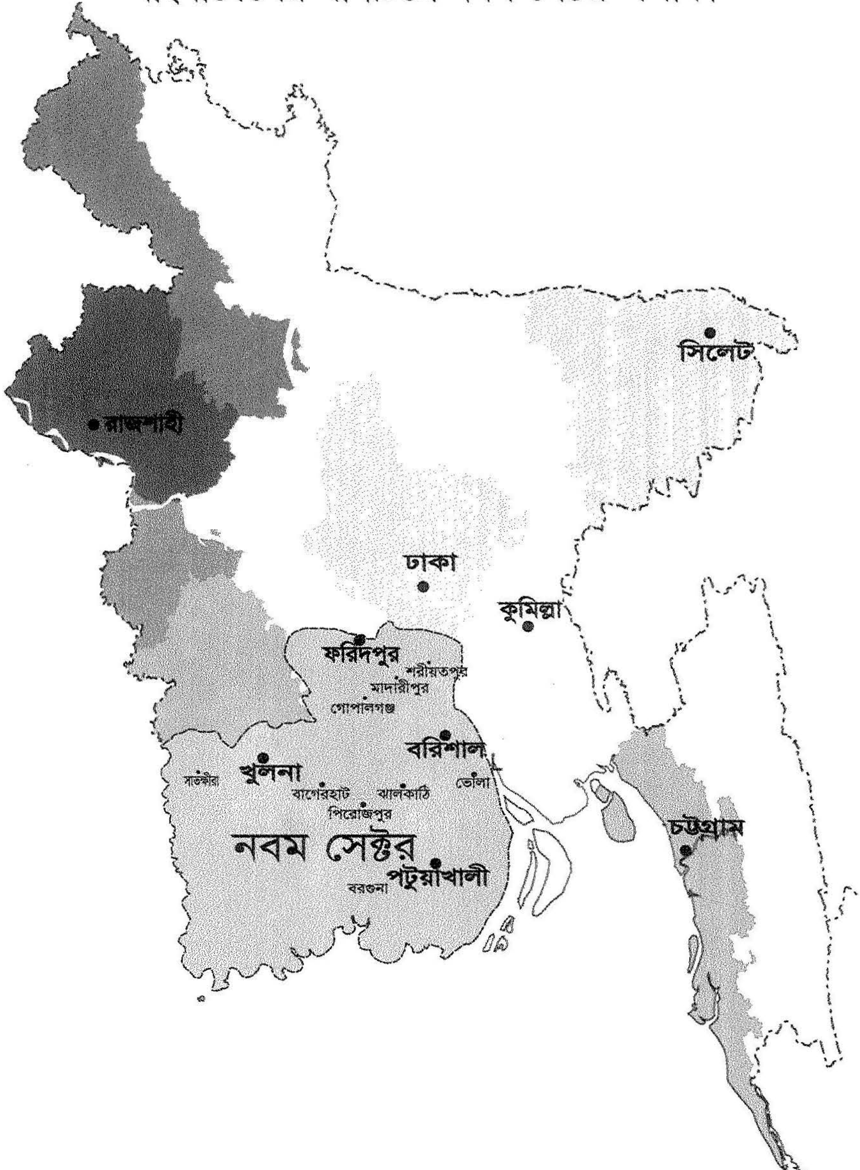

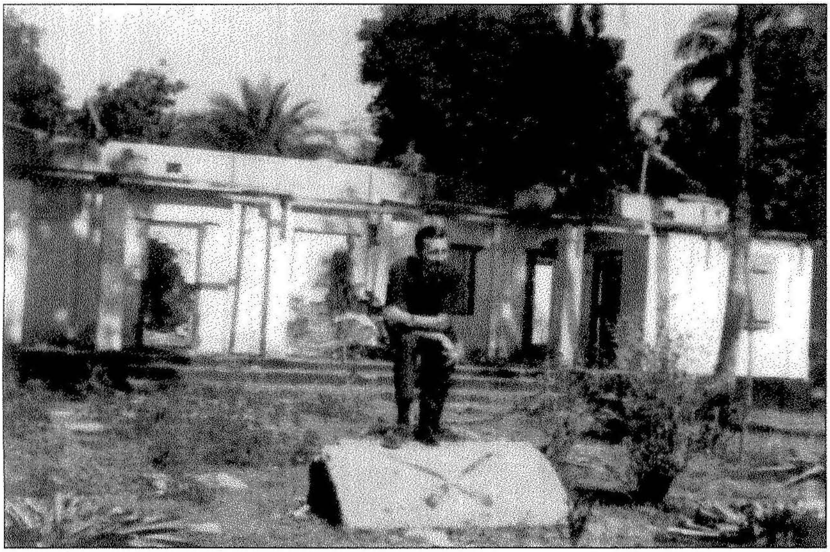

সাতক্ষিরার দেবহাটা বি,ও,পি মুক্তি যোদ্ধাদের দখলে আসার পর একজন বিদেশী সাংবাদিকের পরিদর্শন

২৩ নভেম্বর মুক্ত বসন্তপুর-কালিগঞ্জে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তার পিছনেই দাড়িয়ে সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে মুক্ত এলাকায় সম্বর্ধনা

খুলনার মুক্ত এলাকায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা চাষআবাদে ব্যস্ত

পাক বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত রাজাকার কমান্ডোরা ৯ নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার উড়িয়ে দেয়ার জন্য এলে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়

দেবহাটা থানার মুক্ত এলাকায় মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী স্থানীয় জনগনের উদ্দেশ্যে ভাষন দিচ্ছেন। বা থেকে বসা লেঃ শেখ কামাল, মেজর এম.এ.জলিল ও ক্যাপ্টেন হুদা (সর্বডানে)।

মুক্ত এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প দেবহাটাতে সীমান্তনদী ইছামতি পাড়ি দিয়ে চলছেন যুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন ডাঃ সাহজাহান (মেজর জেনারেল অবঃ)

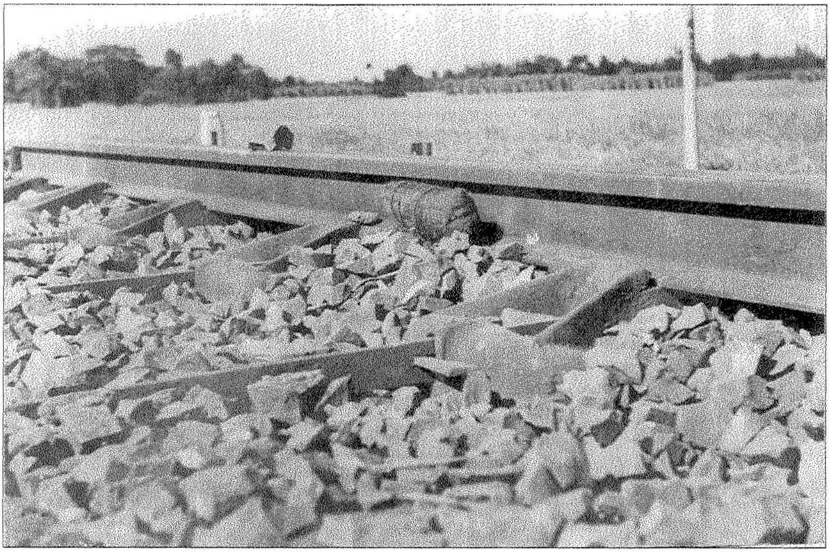

ভারতের বসিরহাট এলাকায় পাকবাহিনী প্রেরিত রাজাকার কমান্ডোদের রেল লাইনের সাথে পেতে রাখা মাইন

তিন রাজাকার অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পন করলে উক্ত অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাগন।
হাপ পেন্ট পরা ভারতীয় এন সি সির লেঃ মুখার্জি পাশে আনসার এডজুটেন্ট আলী আকবর

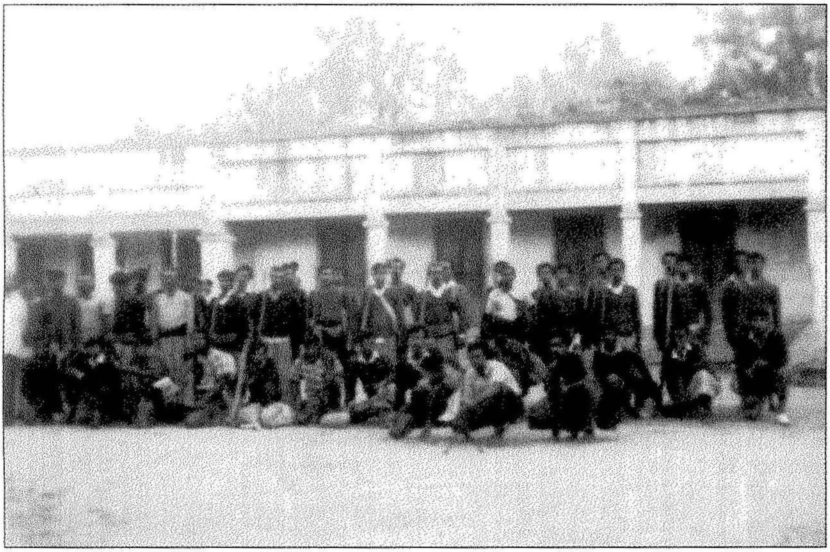

বেইজ ক্যাম্প থেকে অপারেশনে যাবার সময়ে এক দল প্রশিক্ষিত গেরিলা মুক্তি যোদ্ধা

মুক্ত দেবহাটা থানা হেডকোয়াটার সংলগ্ন মাঠে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং

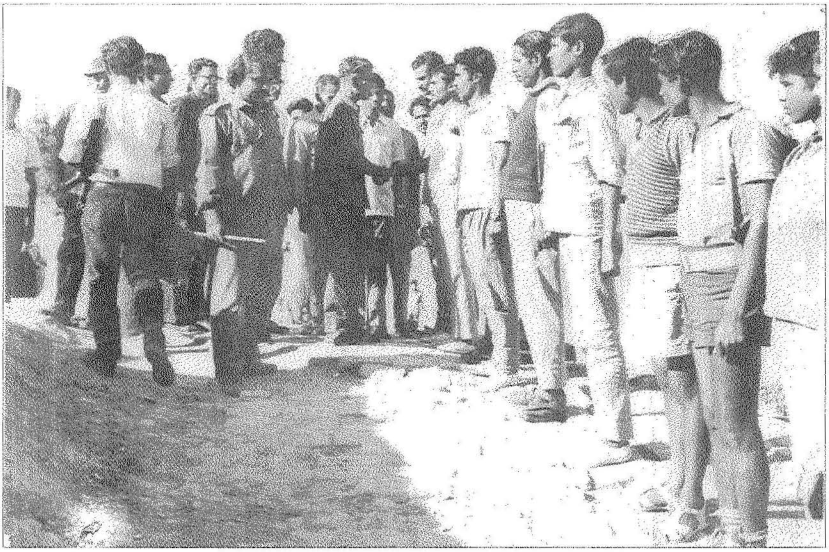

কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী, মেজর জলিল, মুক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে

মুক্তিযুদ্ধ কালীণ ক্যাপ্টেন বেগ এর পরিচালনায় ৯ নং সেক্টরের প্রথম গঠিত বিচ্ছু বাহিনী ট্রেনিং নিচ্ছে

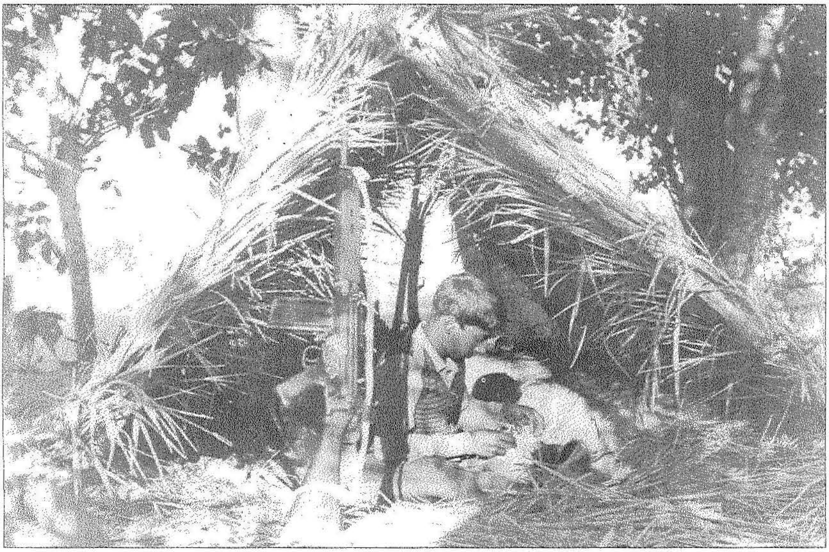

মুক্ত এলাকার সম্মুখ প্রান্তে (ফ্রন্ট লাইন) মুক্তি যোদ্ধাদের বিশ্রামের স্থান

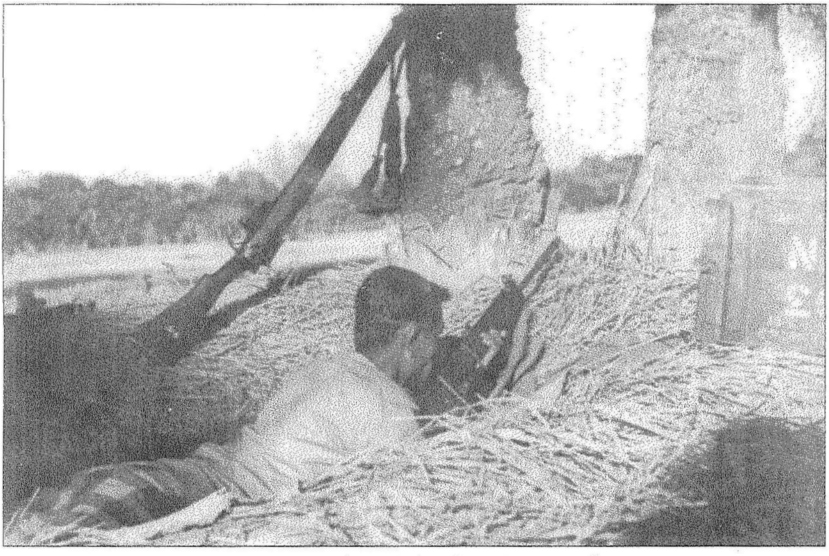

মুক্ত এলাকার সম্মুখ লাইনে (ফ্রন্ট লাইন) প্রহরারত মুক্তিযোদ্ধা

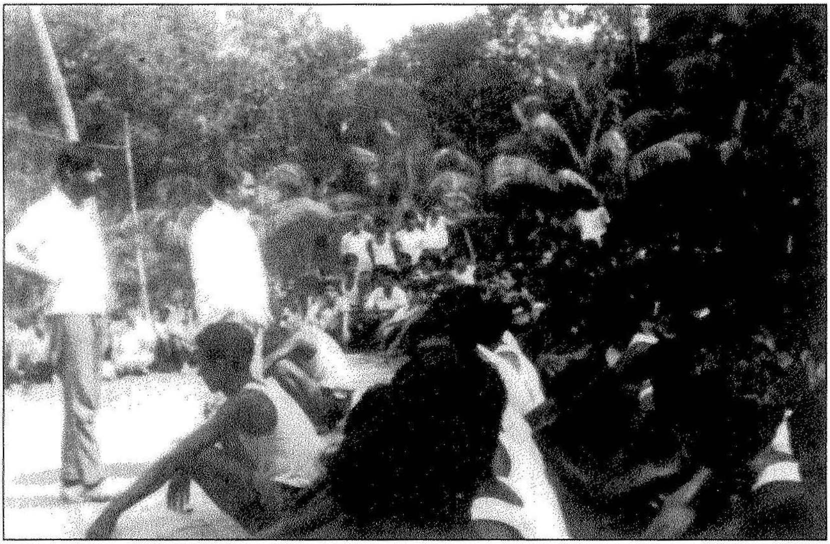

বাকুন্ডিয়া ইনডাকসন ক্যাম্পে মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে ভাষনরত সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল
পাশে দন্ডায়মান ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আহমেদ

কালিগঞ্জ থানা দখলের পর কর্নেল ওসমানী পরিদর্শনে এলে কালীগঞ্জ নদীর ঘাট থেকে উঠছেন মেজর জলিল,
পাশে ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার এবং ডানে সুবেদর মেজর মোঃ আব্দুল জলিল

সাতক্ষিরার শ্যামনগরের হরিনগর ক্যাম্পে রাজাকারদের একদলকে
ফায়ারিং স্কোয়াডের উদ্দেশ্যে নদীর তীরে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তি যোদ্ধারা

৯নং সেক্টরের প্রথম বেইজ ক্যাম্প ভারতের হাসনাবাদের তকিপুরে ব্যাবহৃত জিপ গাড়ীতে নেভাল অফিসার ক্যাপ্টেন খুরশিদসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ৯ নং সেক্টরের প্রথম শহীদের মরদেহ নিয়ে এসেছে জানাজার জন্য।

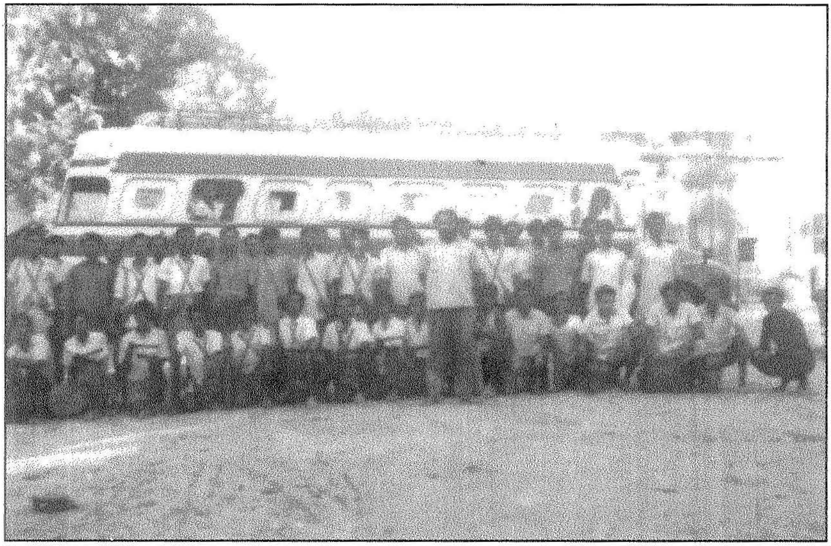

গেরিলা ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভিতর প্রেরনের পূর্ব মুহুর্তে
পিছনে একমাত্র বাহন যশোর থেকে আনা একটি বাস

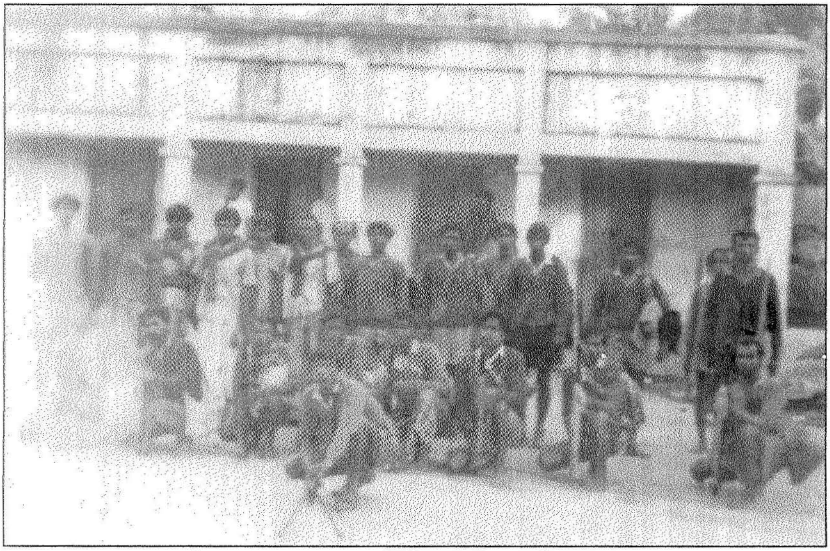

পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশনে যাবার পূর্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা

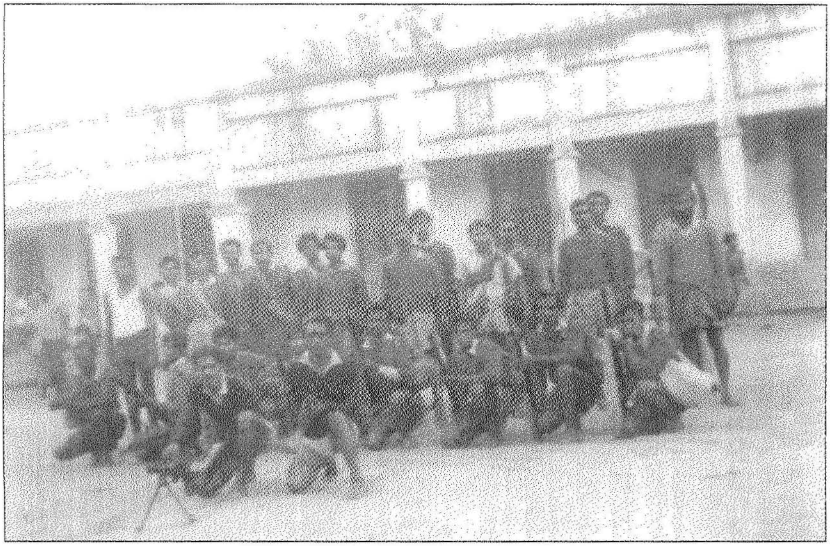

অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা

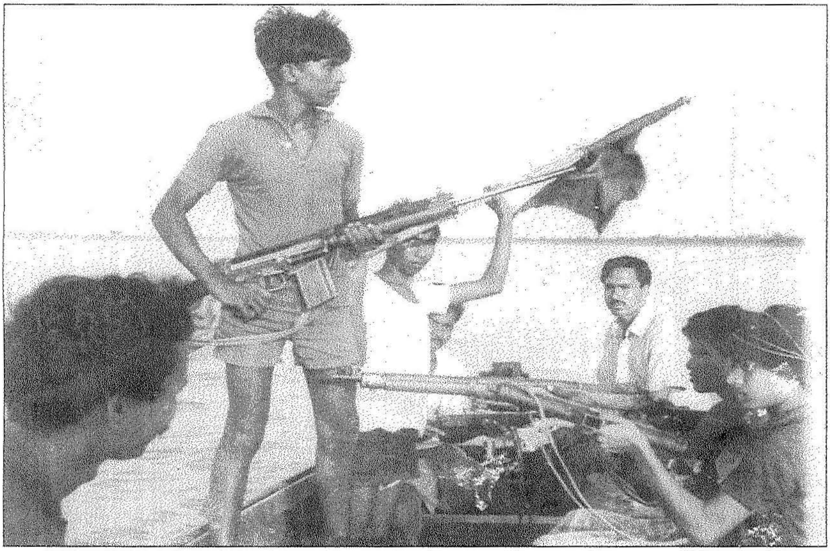

সীমান্ত নদী ইছামতি (কালিন্দি) পাড়ি দিয়ে মুক্তি যোদ্ধারা আপারেশনে যাচ্ছে,
বায়ে ক্যাপ্টেন ডাঃ সাহজাহান (মেজর জেনারেল অবঃ), দাড়িয়ে আছে কিশোর মুক্তি যোদ্ধা স্বপন

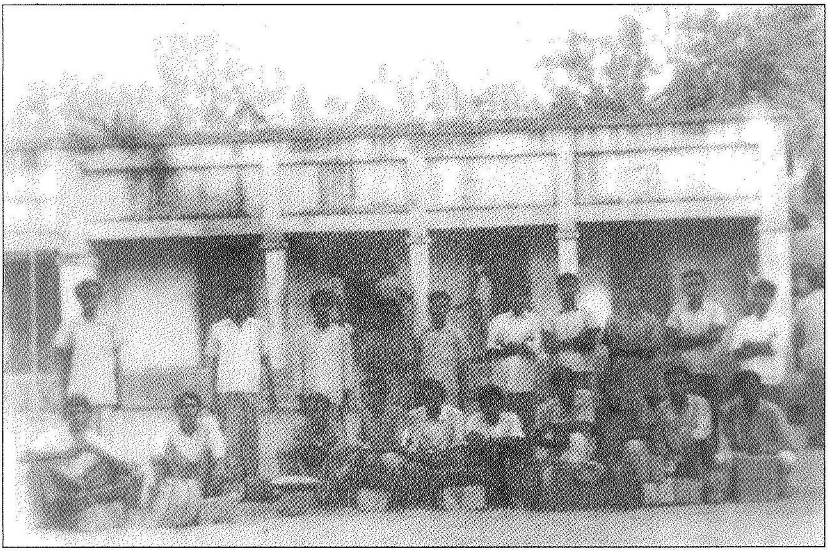

অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা

মুক্ত এলাকায় প্রশিক্ষনরত মুক্তিযোদ্ধারা

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটার এবং বাকুন্ডিয়া ইনডাকসন ক্যাম্প মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্য
পাক বানিহী কতৃক প্রেরিত রাজাকার কমান্ডোদের মাইনসহ আটক করে মুক্তি যোদ্ধারা

অপারেশনে যাবার পূর্বে মুক্ত এলাকা হরিনগর বেইজ ক্যাম্পে স্থানীয় ৪ (চার) কমান্ডার

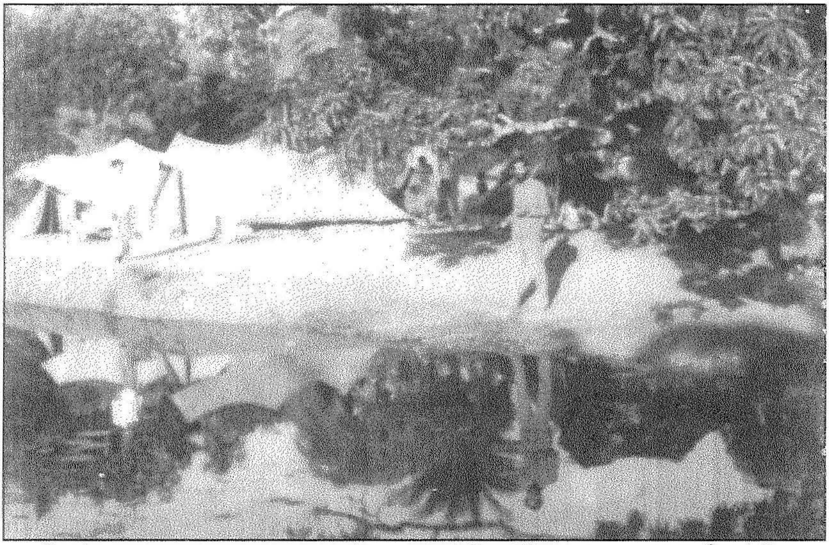

বাকুন্ডিয়া ইনডাকসন ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন দাড়িয়ে আছেন ফ্রগম্যান শীপ ট্রেনিং এর জন্য ব্যবহৃত ক্যাম্পের পিছনে দিঘীর পার্শে

একদল মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে, পিছনে বহনকারী সেক্টরের বাহন যশোরের একটি বাস

সাতক্ষিরার দেবহাটা বিওপি দখলের পর দৃশ্য

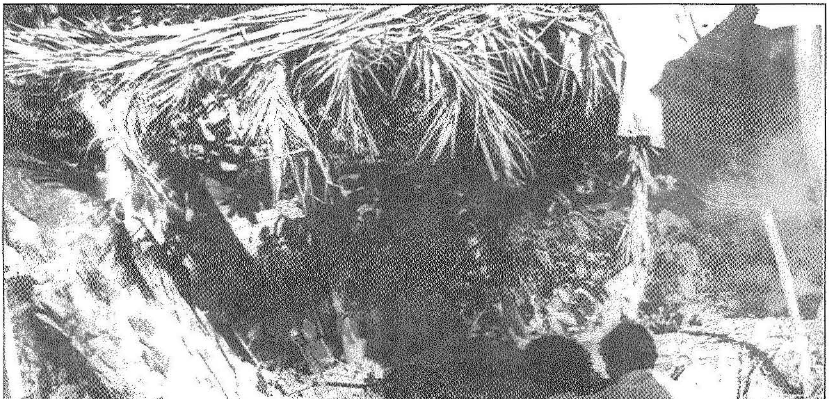

মুক্ত এলাকার অগ্রভাগে মুক্তি যোদ্ধারা পাকবাহিনীর অবস্থানের মুখোমুখি পাহারারত

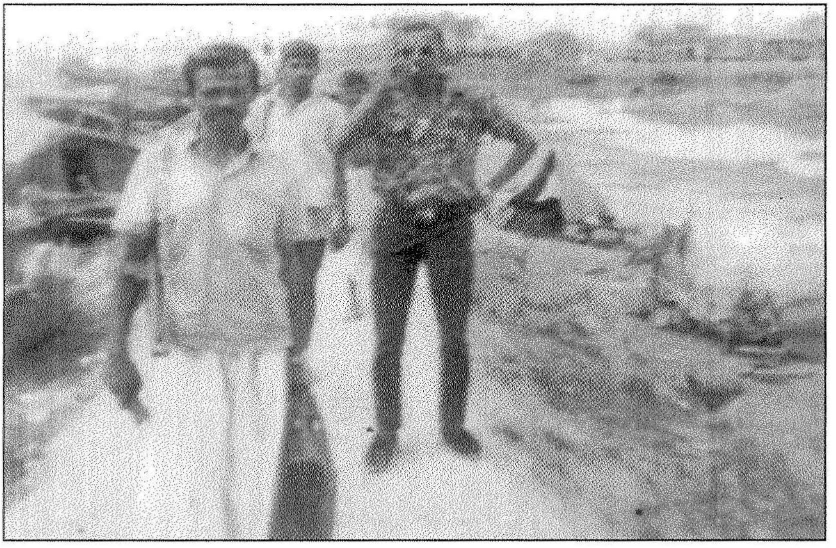

সুন্দরবন সংলগ্ন মংলা পোর্টের নিকট থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে যাওয়া ১টি চাল বাহী লঞ্চ বিউটি অফ খুলনা দখল করে হাসনাবাদে নিয়ে আসেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন বেগ

সাতক্ষিরার টাউন শ্রীপুর বিওপি দখলের পর মুক্তি যোদ্ধারা

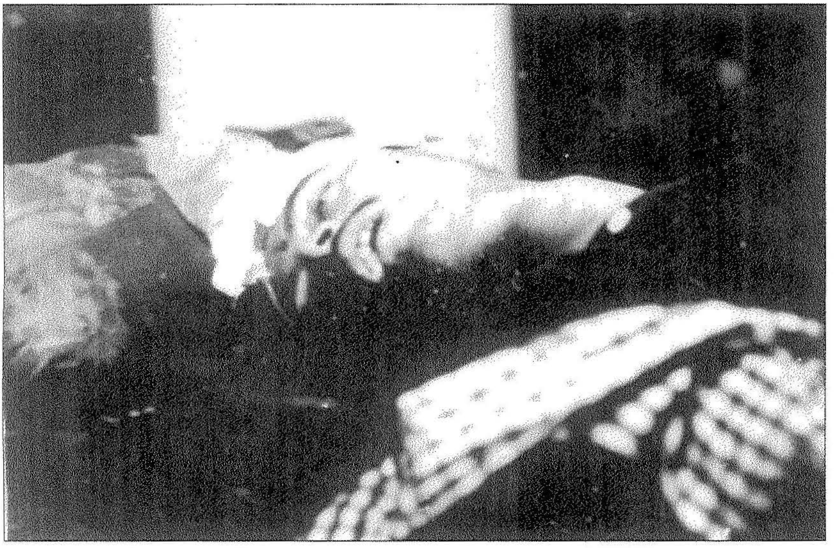

৯নং সেক্টরের পারুলিয়া এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে প্রথম শহীদ ইউনুসের মৃতদেহ

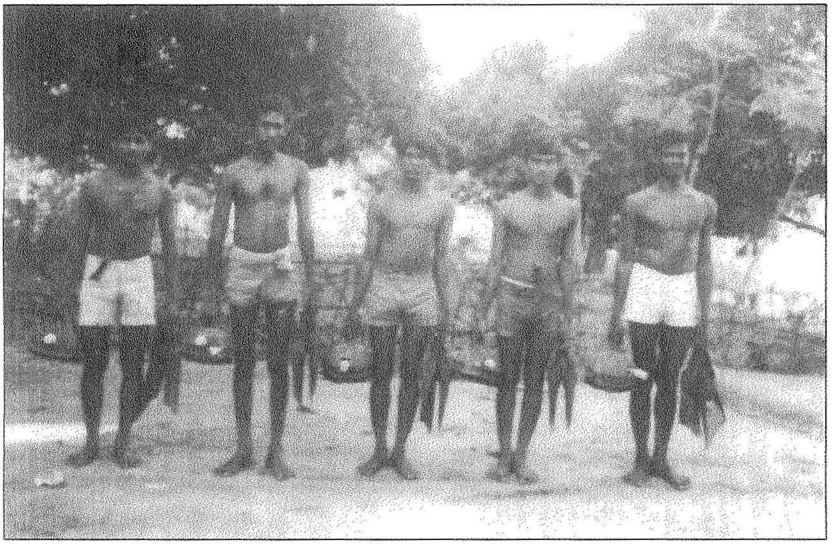

ফ্রগম্যান ট্রেনিংরত বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে পাঁচজন ফ্রগম্যান মুক্তি যোদ্ধা

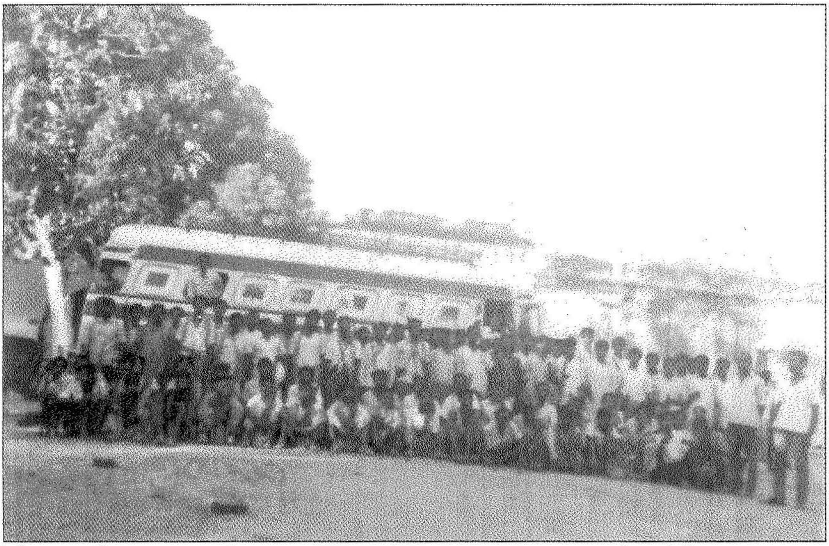

ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তি যোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরনের পূর্ব মূহুর্ত, পিছনে তাদের জন্য ব্যবহার্য্য ৯নং সেক্টরের একমাত্র যাত্রীবাহি বাস

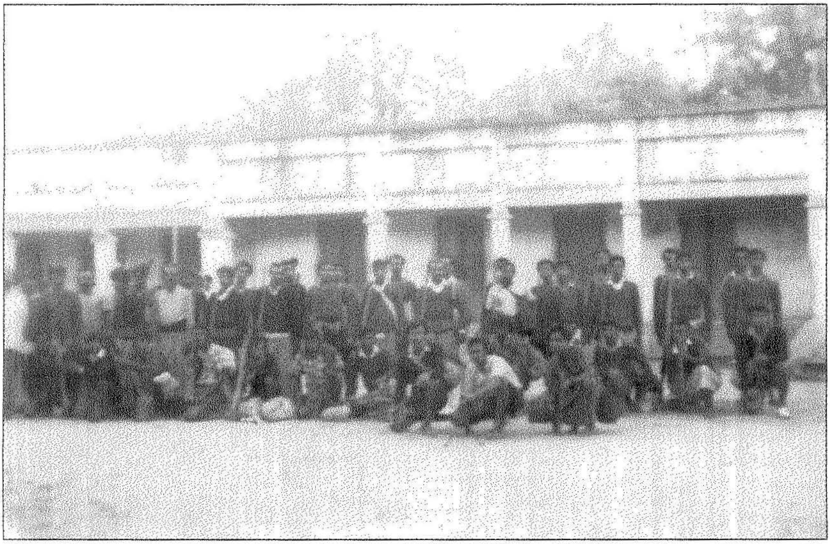

বেইজ ক্যাম্প থেকে অপারেশনে যাবার সময়ে এক দল প্রশিক্ষিত গেরিলা মুক্তি যোদ্ধা

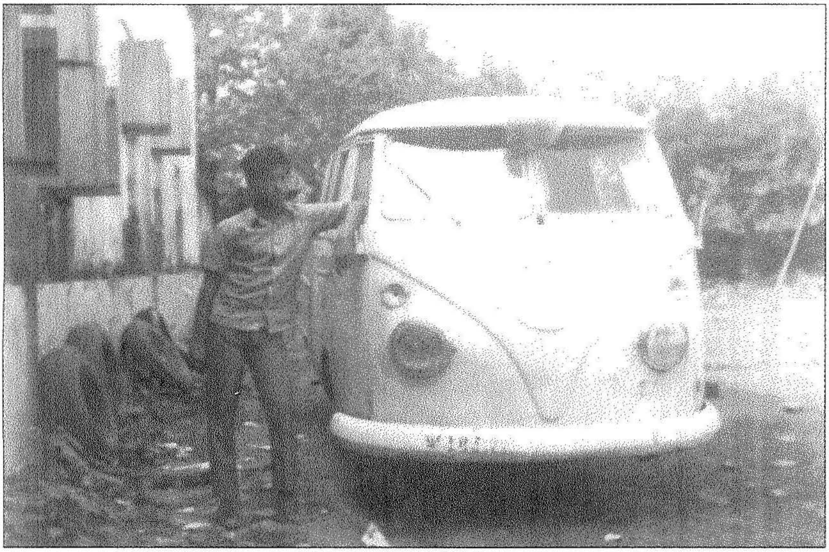

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারের মেডিকেল ইউনিট কর্তৃক ব্যবহৃত এম্বুলেন্স।
খুলনায় পাক বাহিনী আত্মসর্ম্পন কালে সেক্টর কমান্ডার এই গাড়িটি নিয়ে অফিসারদের সহ দৌলতপুর যান।

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারে তৎকালিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দাকার মোস্তাক আহম্মদ পরিদর্শনে আসেন। সাথে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল

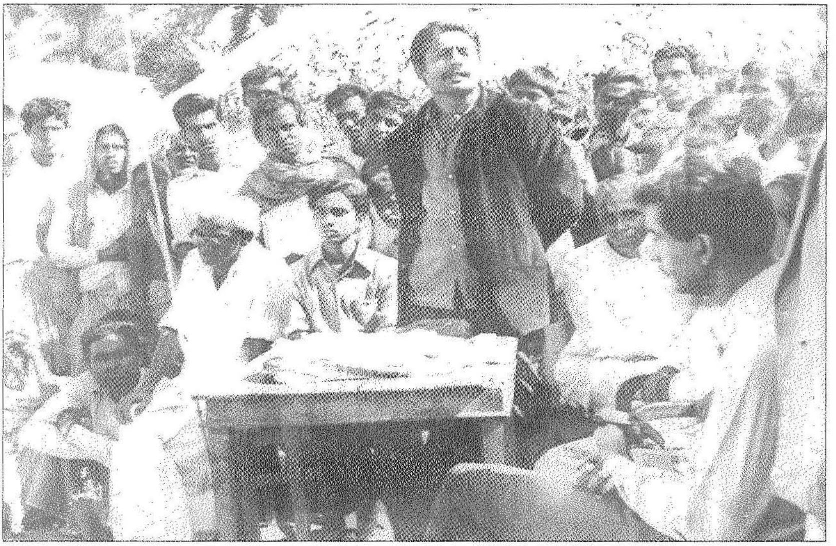

২০ নভেম্বর মুক্ত কালিগঞ্জে মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এম, এন, এ নুরুল ইসলাম মঞ্জু ভাষন দিচ্ছেন

উকসা বিওপি মুক্ত করার পর স্থানীয়দের সাথে সেক্টর সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা

অস্ত্রের ট্রেনিং গ্রহন করছে মুক্তিযোদ্ধারা

সেক্টর কমান্ডার কতৃক ব্যবহৃত জিপ পাশে দন্ডায়মান ড্রাইভার আবছার

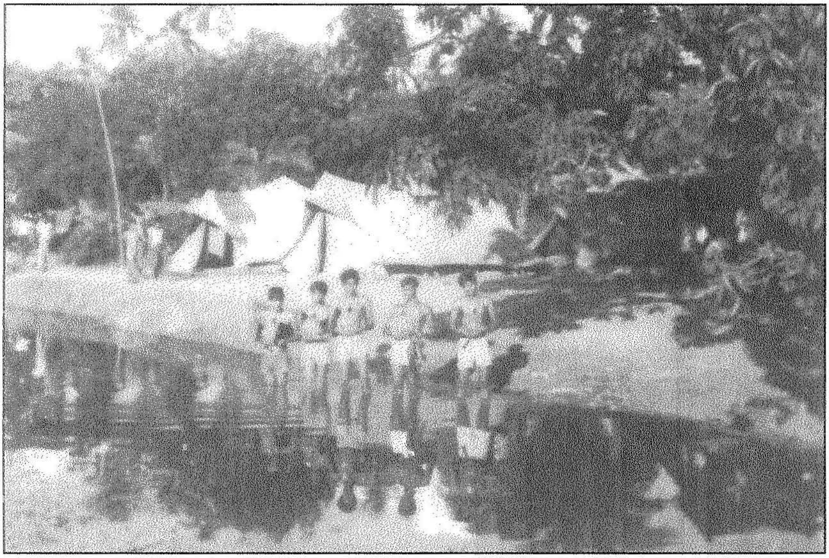

বাকুন্ডিয়া বেইজ ক্যাম্পে ফ্র্যাগম্যান কমান্ডোদের ট্রেনিং চলছে।

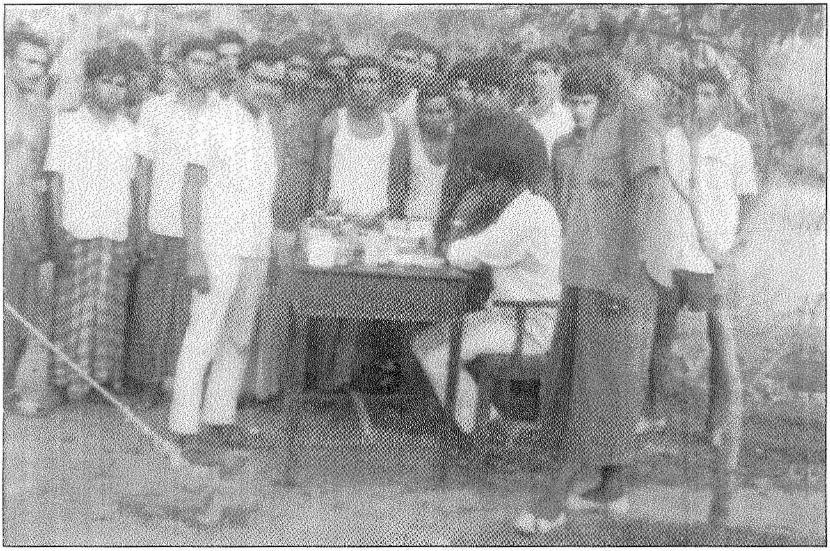

মুক্ত এলাকায় মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদানরত সেক্টর মেডিকেল টিম

সেক্টর হেড কোয়াটরে বাম থেকে লেখক, মেজর জলিল, সার্জেন্ট ফজলুল হক।
পিছনে ডান দিক থেকে ক্যাঃ ডঃ সাজাহান, মেজর জিয়া উদ্দিন, সেক্টর সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা এবং হাবিলদার নাজিম উদ্দিন

৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারে কর্মরত স্টাফ এবং অফিসারগন, ডানদিক থেকে লেঃ সলিমুল্লাহ, লেখক, লেঃ মফিজ, সামনে আনসার কমান্ডার রউফ পাশে লেঃ চৌধুরী, শেখ ফরিদ এবং বড়ুয়া

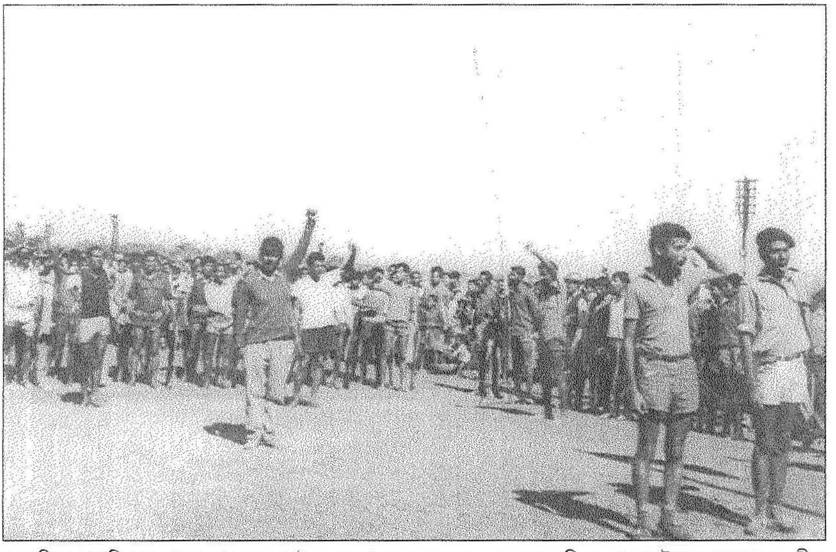

সাতক্ষিরার কালিগঞ্জ দখলের পর ৯নং সেক্টরের অপারেশন কমান্ডার এবং সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদার কমান্ড অধীন মুক্তিযোদ্ধারা। সামনে বাম পাশে শ্লোগান রত লেঃ মোহাম্মদ আলী এবং লেঃ আহসান উল্লাহ্ (ডানে)

মুক্ত দেবহাটা থানা হেডকোয়াটার সংলগ্ন মাঠে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং

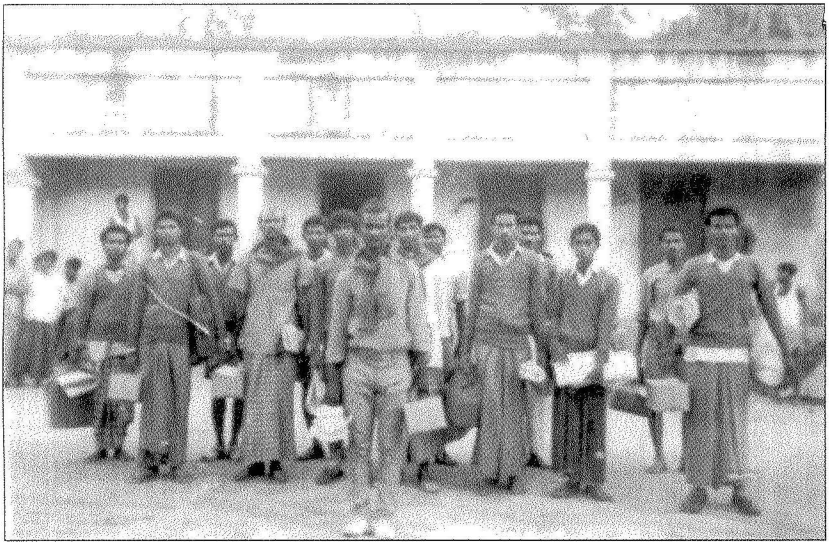

অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে বেইজ ক্যাম্পে একদল মুক্তিযোদ্ধা

যৌথ বাহিনী কতৃক সাতক্ষিরা দখলের পর ভারতীয় সেনা ও সিভিল অফিসারগণ সাতক্ষিরা ডাক বাংলোতে মুক্তি যোদ্ধা অফিসারদের সাথে পরবর্তী করনীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন

কালিগঞ্জ দেবহাটা মুক্ত এলাকায় প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী সফরে এলে সর্বডানে মেজর জলিল নেভাল অফিসার আলম, ক্যাঃ খুরশিদ, ক্যাঃ ডাঃ সাহজাহান, সেক্টর সহঅধিনাক ক্যাঃ হুদা ও মুক্তি যোদ্ধাগণ

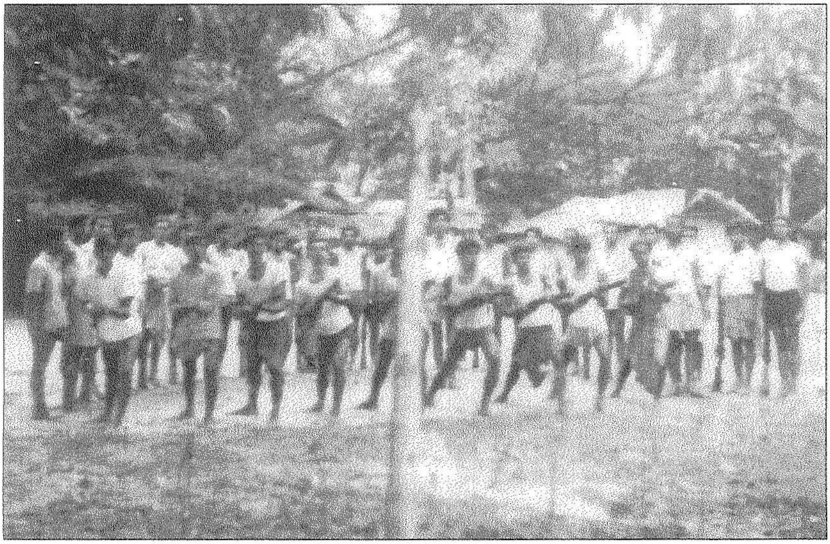

মুক্ত এলাকায় মুক্তি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষন প্রদান

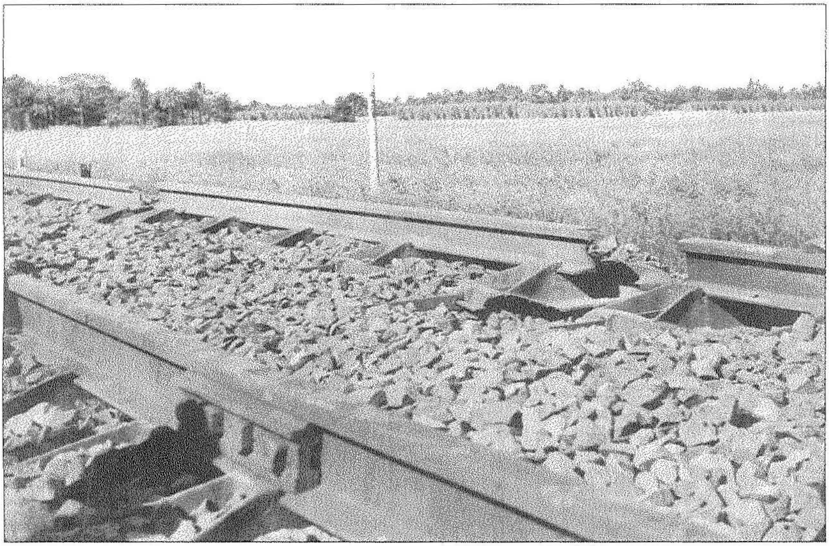

পাকবাহিনী রাজাকার কমান্ডো পাঠিয়ে ভারতের বশিরহাট এলাকায় ট্রেন লাইন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়

৯নং সেক্টরের মুক্ত এলাকায় চাষিদের ধান কাটার সময় প্রহরারত মুক্তিযোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে

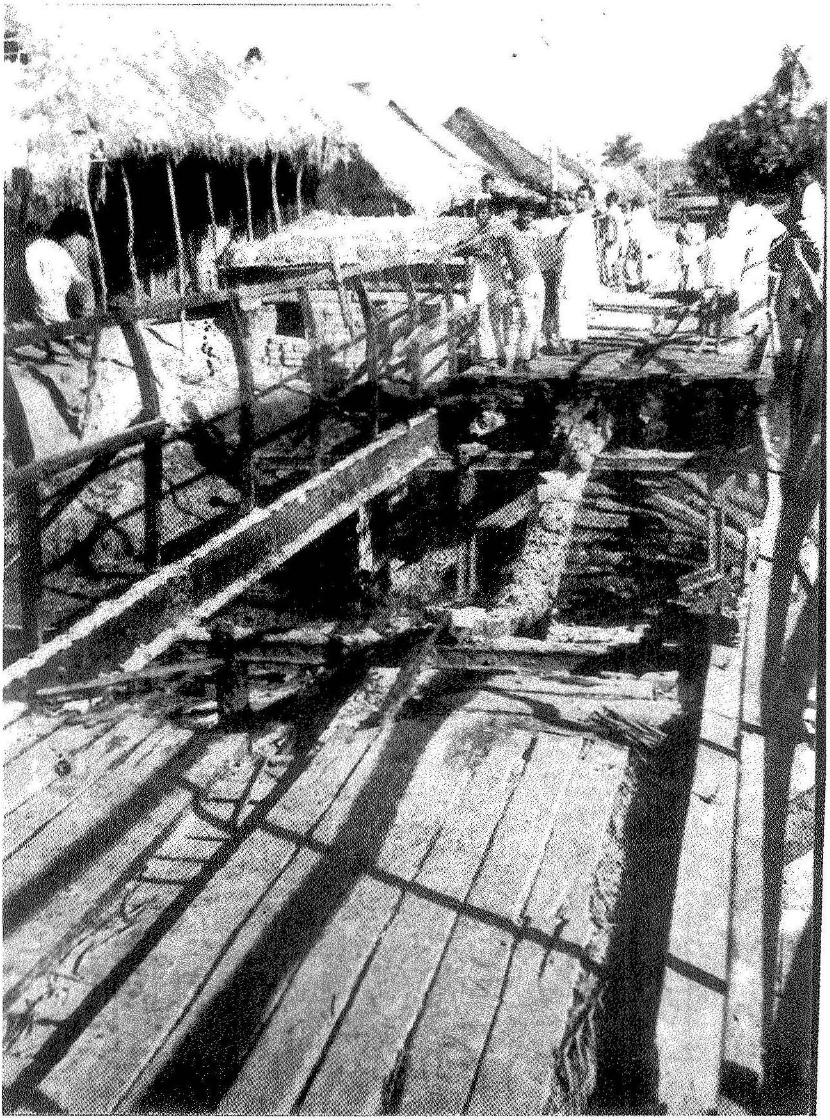

ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী কতৃক ধংসকৃত সাতক্ষিরার পারুলিয়া ব্রিজ

এম,এন,এ নুরুল ইসলাম মঞ্জু, ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে মুক্তি যোদ্ধারা নৌকার বহর নিয়ে সুন্দরবনের মাঝ দিয়া এগিয়ে যাচ্ছে বরিশালের দিকে

"গাবুরা" আক্রমনে এল এম জি সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধাদের বোট - ক্যাপ্টেন বেগ, লেঃ তোফাজ্জেল, লেঃ মইনুলসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধারা

হরিনগর ডিফেন্স পজিশনে এইচ এমজি (হ্যাভি মেশিনগান) নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা গান বোট আক্রমনের অপেক্ষায় ওৎপেতে আছে বাঙ্কারে

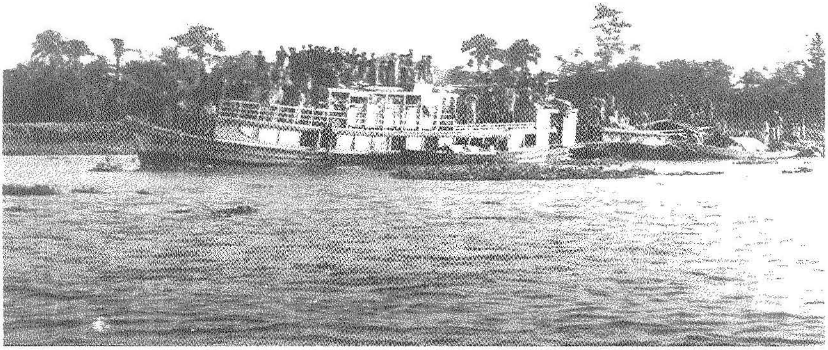

ক্যাপ্টেন বেগ এর নেতৃত্বে করায়ত্ব "বিউটি অব খুলনা" লঞ্চের সাথে নৌকার বহরসহ মুক্তিযোদ্ধারা বরিশাল যাচ্ছে

বরিশাল পতনের পর প্রদত্ত সম্বর্ধনায় ভাষণ দিচ্ছেন এম,এন,এ নুরুল ইসলাম মঞ্জু, পাশে দাড়িয়ে কমান্ডার ক্যাপ্টেন বেগ

হরিনগর অপারেশন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধারা খেয়ে নিচ্ছে তাদের দিনের খাবার

হিঙ্গলগঞ্জ অপারেশন বেইজ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছে

পারুলিয়া ব্রিজ দখলের পর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানী, সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এবং সেক্টর সহাধিনায়ক ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা (হিরু) অপারেশন ম্যাপ নিয়ে পরবর্তী আক্রমনের পরামর্শ করছেন

স্যামনগর থানা দখলের পর স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে শহীদ সুবেদার ইলিয়াস

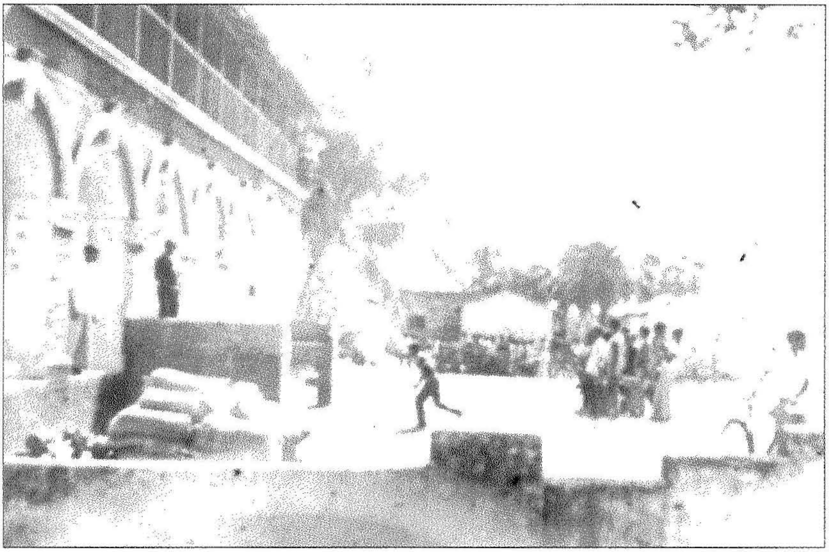

মুক্ত সাতক্ষিরার দেবহাটা থানা ভবন

ক্যাপ্টেন বেগ ও লেঃ তোফাজ্জলের নেতৃত্বে পাক বাহিনীর কাছ থেকে দখলকৃত লঞ্চ "বিউটি-অব-খুলনা"

৯নং সেক্টরের অপারেশন বেইজ ক্যাম্প হিঙ্গল গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের ট্রেনিং

স্থানীয় গ্রামবাসীদের দেয়া দুপুরের খাবার গ্রহন করছে মুক্ত এলাকায় টহলরত মুক্তিযোদ্ধারা

৯নং সেক্টরের নৌকমান্ডের হ্যাবহৃত হ্যাভি মেশিনগান সজ্জিত গানবোট ''বঙ্গবজ্র'' সহ আরও দুটি বোটে নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা

২৬শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল বরিশালে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সচিবালয়ের দায়িত্বে নেতৃবৃন্দ।

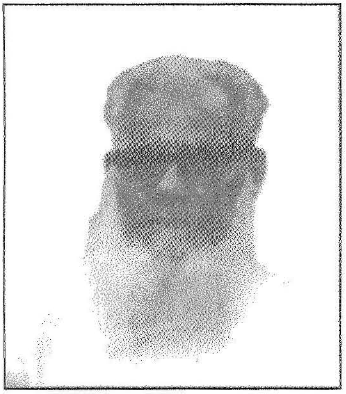

আবদুল মালেক খান
অর্থ বিভাগ

এডভোকেট নুরুল ইসলাম মঞ্জু, এম, এন, এ
বেসামরিক বিভাগ প্রধান

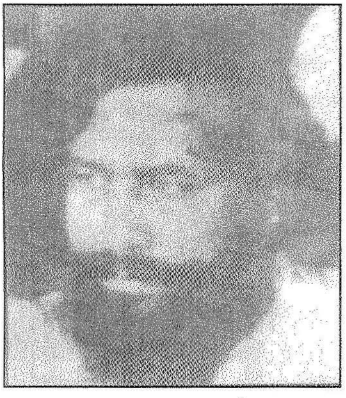

মেজর এম.এ.জলিল
সামরিক বিভাগ প্রধান

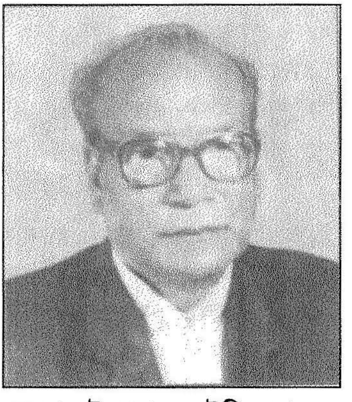

এডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারি

মহিউদ্দিন আহমেদ, এম, পি, এ
খাদ্য বিভাগ

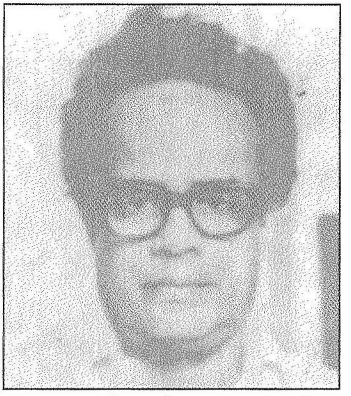

এডভোকেট আমিনুল হক চৌধুরি
আইন ও বিচার বিভাগ

এডভোকেট এম শামসুল হক, এম, এন, এ
জ্বালানী বিভাগ

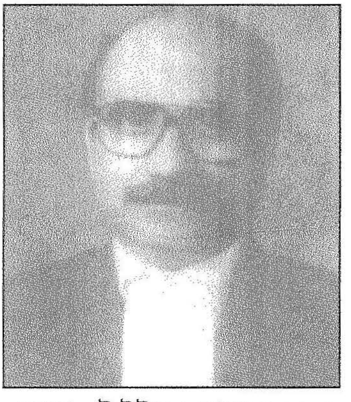

এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন
তথ্য ও প্রচার বিভাগ

২৬শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল বরিশালে গঠিত
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সচিবালয়ের দায়িত্বে নেতৃবৃন্দ।

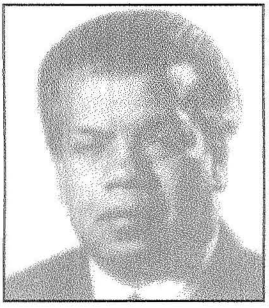

এডভোকেট আমির হোসেন আমু, এম, পি, এ
ত্রান ও পুর্নবাসন বিভাগ

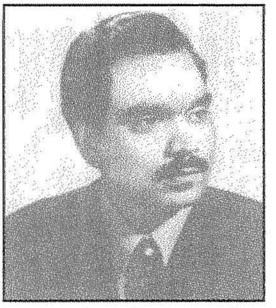

এডভোকেট সর্দার জালাল উদ্দিন
যোগাযোগ বিভাগ

আবদুল বারেক
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বরিশালের ছাত্র নেতৃবৃন্দ

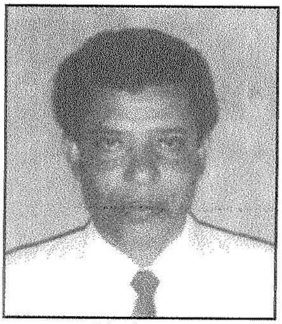

শেখ আবদুর রব
আহবায়ক
(সভাপতি বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ) ১৯৭০-৭১

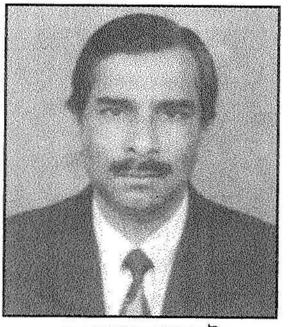

মনসুরুল আলম মন্টু
সদস্য সচিব
(সাঃ সম্পাদক বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ) ১৯৭০-৭১

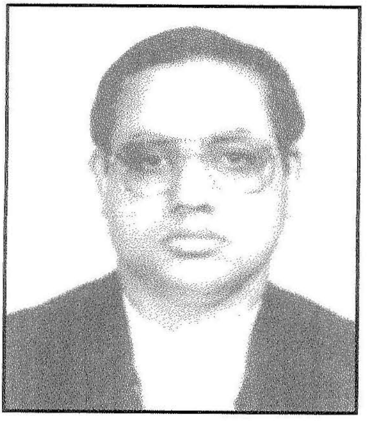

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা
সদস্য

হাবিবুল ইসলাম আনিছ তালুকদার
সদস্য

জহিরুল ইসলাম খান পান্না
সদস্য

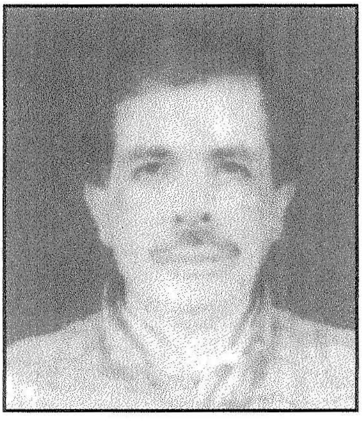

খান আলতাফ হোসেন ভুলু
সদস্য

মুশফিকুর রহমান খান কবির
সদস্য

শামসুল আলম
সদস্য

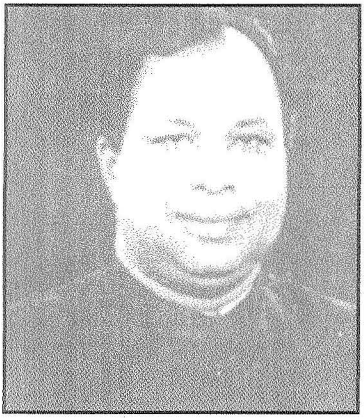

মনিরুল হাসান খান মনির
সদস্য

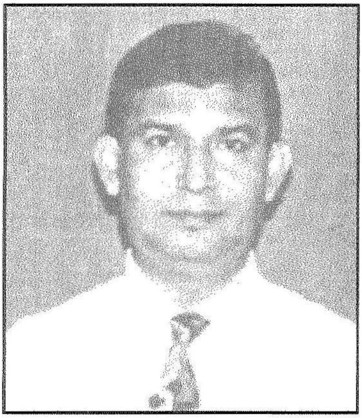

মাসুদ মাহমুদ খান
সদস্য